ত্রিভুজে রক্তের দাগ

গৌতম রায়

শংকর প্রকাশন ।। কলিকাতা-৬

কর্নেল স্রষ্টা

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

সুজনেষু

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

পঞ্চশর (রহস্য উপন্যাস)
ব্ল্যাকপ্রিন্স (রহস্য উপন্যাস)
নির্মলেরা খুন হচ্ছে (রহস্য উপন্যাস)
শ্রীমতী ভয়ংকরী (উপন্যাস)
কনে বিভ্রাট (উপন্যাস)
রত্নহার রহস্য (ছোটদের রহস্য উপন্যাস)
পরম প্রেমী (উপন্যাস)
কাঞ্চন অভিলাষ (উপন্যাস)
প্রতিনিয়ত (উপন্যাস)
পাপ অপাপ (উপন্যাস)

লেখকের অন্যান্য বই

গ্রীক প্রেমকথা
গ্রীক ট্র্যাজেডি
ছোটদের ইলিয়াড
ছোটদের ওডিসি
নিহতের কান্না (রহস্য উপন্যাস)
সোনার ঈগল (রহস্য)
পাপাড়ি রহস্য (রহস্য)
পঞ্চম পিতা (রহস্য)
প্রেমিকের মৃত্যু (রহস্য)
তখন রাত বারোটা (রহস্য উপন্যাস)
খুনটা হতে পারতো (রহস্য)
অশান্ত শান্তনীড় (রহস্য)
সোনার প্যাঁচা (রহস্য)
শতরূপে নারী
স্বৈরিণী
ইতিহাসের জ্যান্ত ভূত
খাঁচার পাখি (নাটক)
পদ্মপাতায় জল (নাটক)
গোপন সত্য (রহস্য একাঙ্ক)
আয়তি নিরুদ্দেশ (রহস্য উপন্যাস)
ওলট পালট (একাঙ্ক)
মধুরেণ (নাটক)
জুয়েল থীফ (ছোটদের একাঙ্ক)
নিহত শতাব্দী (একাঙ্ক)
ছন্দপতন (নাটক)
কনেবিভ্রাট (নাটক)
শ্রীমান নাবালক (নাটক)
নির্ভীক সমিতি (ছোটদের একাঙ্ক)
সৎকার (একাঙ্ক)
আগন্তুক (শ্রুতি নাটক)
আঁধার সীমানায় (শ্রুতি নাটক)
বউ কথা কও (নাটক)
রাজনিদ্রা (নাটক)
রঙ্গ ব্যঙ্গ একাঙ্ক (একাঙ্ক সংকলন)
অশোকার অসুখ (প্রমীলা একাঙ্ক)
নাতজামাই (নাটক)
নো প্রবলেম (নাটক)
এই আমি (একাঙ্ক)
আশা নিরাশা (একাঙ্ক)
ভাঙ্গাদুর্গ ভয়ংকর (ছোটদের রহস্য)

নিখুঁত হত্যার পরিকল্পনা

ইচ্ছে করেই মনসিজ চৌধুরী জায়গাটা বেছে নিয়েছিল তার গবেষণার জন্য। শহর-কোলাহল থেকে অনেক দূরে। পাহাড় আর জঙ্গলে ঘেরা ছোট্ট একটা বাংলো। ল্যাবরেটরিটা ঐ একই চৌহদ্দির মধ্যে। সীমানা পাঁচিলের পরই শুরু হয়েছে বাঁশ আর ঝাউবন। তারা গিয়ে মিশেছে গভীর অরণ্যে। অরণ্যকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল পাহাড়। লোকে বলে ঐ পাহাড়ের নাম নাকি নীলগাই। কেন, সেটা কারো জানা নেই। মাথা ব্যথাও নেই।

মনসিজের বিষয় ক্যানসার। অনকোলজিস্ট। সারা পৃথিবীর তাবৎ চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা এই ভয়াবহ মৃত্যু দৈত্যটির বিরুদ্ধে মরণপণ যুদ্ধে নেমেছে। মনসিজ নিজেকে গর্বিত মনে করে সেও সেই যুদ্ধের সৈনিক।

রিসার্চ ফর ক্যানসার ইনস্টিটিউটের পক্ষে ডাক্তার মনসিজ চৌধুরী চিকিৎসকের বিরাট অর্থকরী প্রলোভন ছেড়ে এই অরণ্যবেস্টিত গবেষণাগারে এসে উঠেছে।

ইনস্টিটিউটের সুব্যবস্থায় এই প্রত্যন্ত প্রান্তেও আধুনিক এবং বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামে পূর্ণ মনসিজের ল্যাব। বিদ্যুৎ আছে। টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থাও পরিচ্ছন্ন। সর্বাধুনিক কম্পিউটার যন্ত্রটিও সচল।

বাংলোয় তিনখানা শোবার ঘর। একটি বাথ একটি কিচেন। বাংলোর অন্যদিকে ল্যাব। ল্যাবের পাশে পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্যে কিছু জন্তু জানোয়ার রাখা আছে। সারাক্ষণের কাজের জন্যে ইনস্টিটিউটেরই নিযুক্ত লোক সুরজ। ইনস্টিটিউট মনসিজকে একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট দিতে চেয়েছিল। কিন্তু এই নির্জন সাধনগৃহে সে চেয়েছিল তার একমাত্র সঙ্গিনী হোক তার স্ত্রী ডাক্তার তটিনী চৌধুরী। ইনস্টিটিউট আপত্তি করেনি। কারণ সহকারী হিসেবে তটিনী নির্দ্বিধায় যোগ্য।

মনসিজের বয়েস বেশী নয়। চল্লিশ। তটিনী আটতিরিশ। সেই ছাত্রাবস্থায় দু বছরের জুনিয়ার তটিনী মিত্রের সঙ্গে মনসিজের পরিচয়। তটিনীকে আশ্চর্যসুন্দরী বলা যায়। হ্যাঁ তাই। কোন মানুষই সর্বাঙ্গসুন্দর হয় না। অতি বড় সুন্দরীও কোথাও না কোথাও একটা খুঁত থেকেই যায়। এ রকম উদাহরণ হাজারটা দেওয়া যায়। কিন্তু তটিনীর খুঁত ধরা পড়েনি

কারো চোখে। স্বাস্থ্য, দৈহিক গঠন, রঙ, চলন, বলন সব কিছুই মার্জিত। এতটুকু বাড়তি কিছু নেই। কমও না। তাই সবাই ওকে আশ্চর্যসুন্দরী বলে ডাকত।

সুন্দরীর পিছনে স্তাবকের দল থাকবেই। তটিনীর ঐ বয়েসেই বহু পুরুষবন্ধুই ওকে একান্ত করে পেতে চেয়েছিল। চেয়েছিল পারিজাত আর অয়স্কান্তও। যদিও অয়স্কান্ত, পারিজাত, মনসিজ আর তটিনীর মধ্যে ছিল এক আলাদা ধরনের বন্ধুত্ব। মনসিজ যখন জানতে পারল, পারিজাত আর অয়স্কান্তর মনোবাসনা নিজেকে সে সরিয়ে নিয়েছিল প্রতিযোগিতা থেকে। কারণ ছিল। মনসিজ বরাবরই স্বভাব লাজুক। কারো সঙ্গে কোন বিদ্বেষ তার ভালো লাগতো না। হয়তো এক ধরনের ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স কাজ করতো। পিতৃমাতৃহীন ছোট বেলাটা কেটেছে নিদারুণ দারিদ্র্যকে ফেস্ করে। তটিনীর রূপ গুণ, কথা বলা তাকে আকৃষ্ট করেছিল ঠিকই। কিন্তু তার দিকে চাওয়ার হাত বাড়ানোর ইচ্ছে বা স্পর্দ্ধা তার ছিল না। অনেক কষ্ট করেই বি. এস. সি. পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। কিন্তু গরীব বলে কাউকে ভালবাসা যায় না এটাও তো ঠিক না। মনসিজ তটিনীতে আসক্ত হলেও স্বভাব লাজুকতা এবং নিজের স্টেটাসের কথা ভেবে সে সর্বদাই নিজেকে গুটিয়ে রাখতো। ধনী কন্যা তটিনীকে প্রেম নিবেদনের কথা ভাবার মতো বিলাসিতা তার ছিল না। সে তাকে সযত্নে নিজের মধ্যে রেখে দিয়েছিল। তটিনী ছিল তার অনুচ্চারিত প্রেম।

এ ব্যাপারে অগ্রণী ছিল তার আর দুই বন্ধু। পারিজাত সেন আর অয়স্কান্ত রায়। দুজনেই অন্তত তার থেকে অনেক বেশী যোগ্য, তটিনীর স্বামী হিসেবে। পারিজাত কলকাতার এক বিরাট লোহা ব্যবসায়ীর একমাত্র সন্তান। বাবা লোহা ব্যবসায়ী হলেও পারিজাতের মধ্যে সে সবের কোন বালাই ছিল না। পারিজাত দেখতে হয়েছিল তার সুন্দরী মায়ের মতো। হ্যাণ্ডসাম, দোহারা চেহারা। পারিজাত সায়েন্সের স্টুডেণ্ট হলেও তার মধ্যে শিল্প সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ছিল। মাঝে মধ্যে সে দু একটা কবিতা লেখেনি তাও নয়। মনসিজকে সে তটিনীর উদ্দেশ্যে লেখা বেশ কিছু বিরহের কবিতা, দুখী দুখী কবিতা তাকে পড়ে শোনাতো। আসলে পারিজাত জানতোই না তটিনীর প্রতি মনসিজের মনোভাব একই। তাহলে হয়তো পারিজাত তটিনীর উদ্দেশ্যে লেখা কবিতাগুলো তাকে পড়াতো না।

আর একজন, অয়স্কান্ত। তাকে ঠিক বুঝতে পারতো না মনসিজ। পারিজাত খোলামেলা। গভীর অমাবস্যায় মুখ স্নান করা অন্ধকার তার মধ্যে ছিল না। তটিনীকে প্রেম নিবেদন করেই বুক ফুলিয়ে সবাইকে সে কথা শুনিয়ে সে ভাবতো অনেক বড় কাজ করা হয়ে গেছে। তটিনীকে না বুঝেই।

কিন্তু অয়স্কান্ত একেবারে বিপরীত চরিত্র। শোনা যেতো সে নাকি রাজা রাজবল্লভের বংশ তস্য বংশধরদের লতায় পাতায় কেউ একজন। বংশ পরিচয় যাইহোক, তার অবস্থা ছিল আর সকলের থেকে একটু আলাদা। জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হবার আগে পর্যন্ত তাদের জমিদারী এলাকা ছিল বিশাল। আসাম আর দার্জিলিঙে বেশ কয়েকটা চা বাগানের মালিক ছিলেন ওর বাপ-ঠাকুরদা। জমিদারী গেলেও বাগানগুলো এখনও আছে। জমিদারীর কমপেনসেশন হিসেবে প্রাপ্য টাকায় অয়স্কান্তর বাবা রিয়েল এস্টেটের মধ্যে মাথা গলিয়ে দিয়েছিলেন।

সেই অর্থে তিন-চার পুরুষ কী তারও বেশী দিন ধরে আয়ত্তায়িত বনেদীয়ানা অয়স্কান্তর সর্বাঙ্গে। এক বাক্যে ও অনুপম এবং অসাধারণ সুপুরুষ বলা যায়। ছ'ফুট লম্বা, ছিপছিপে মেদহীন চেহারা। মুখের মধ্যে গ্রিসিয়ান বিউটি। ব্যবহারে উদ্ধত, স্বভাবে দরাজ এব ংমানসিকতায় উন্নাসিক। তার দেমাকী ভাবটাই তাকে সবার থেকে আলাদা করে রাখতো। হয়তো অয়স্কান্ত নিজেও তাই চাইতো। কিছু চাইলে সেটা তাকে পেতেই হবে। এবং সেটাকে তার দেমাক দিয়েই বলতো, অয়স্কান্ত রায় যেটা চায় সেটা সে জানে সে তা পাবেই। সাধারণত অয়স্কান্ত ক্লাসের কাউকে পাত্তা দিতে চাইতো না। কারণ ক্লাসের অধিকাংশ ছেলে মেয়েই সাধারণ ঘরের। মনসিজের মতোই। তবু চারজনের মধ্যে অদ্ভুতভাবে একাত্মটা এসে গিয়েছিল। সম্ভবত সেটা তটিনীর জন্যেই। সেও তো ধনী ডাক্তারের একটি মাত্র সন্তান।

মনসিজ বুঝতে পারতো অয়স্কান্তর গভীর নজর তটিনীর দিকে। পারিজাত যখন কবিতা শোনাতে আসতো সে কিন্তু একবারের জন্যেও বলতে পারতো না তটিনীর জন্যে তার থেকেও অনেক বিশাল মাপের কেউ অপেক্ষা করছে। হয়তো পারিজাত দুঃখ পাবে, সেই কারণেই।

এমনি যখন অবস্থা, একদিন এক নাটকীয় পরিবেশে সমস্ত ব্যাপারটা একটা চরম জায়গায় পৌঁছে গেল।

বি. এস, সি পরীক্ষার আর বেশীদিন বাকী ছিল না। সেদিন ছিল শেষ ক্লাস। এরপরই চারজন ছিটকে যাবে চারদিকে। পারিজাত শিলিগুড়ির ছেলে। সে চলে যাবে নিজের পৈত্রিক বাড়ি। তটিনী খাস কলকাতার মেয়ে। ও থাকবে কলকাতাতেই। অয়স্কান্ত যাবে কোচবিহার। আর মনসিজ মেদিনীপুর। সম্ভবত পরীক্ষার আগে আর কারো সঙ্গেই কারো দেখা হবে না। ক্লাসে বসেই তিনজনে তিনটে চিরকুট পেয়েছিল তটিনীর কাছ থেকে। লাস্ট মিট্ টোগেদার। ভেনু, তটিনীর বালিগঞ্জের বাড়ি। অকেশান, তটিনীর জন্মদিন। বারই জানুয়ারি।

ওরা তিনজনেই সন্ধ্যের মুখে গিয়ে হাজির হয়েছিল বালিগঞ্জ প্লেসের

বাড়িতে। নিজের সামর্থ অনুযায়ী মনসিজ এক গোছা রজনীগন্ধা আর একটা সুন্দর কলম নিয়ে গিয়েছিল। পারিজাত নিয়ে গিয়েছিল তটিনীর পছন্দের দামী একটা পারফিউম। কিন্তু অয়স্কান্ত একবারের জন্যেও জানায়নি তার উপহারের বস্তুটি কী?

ওরা গিয়ে বসেছিল সাজানো সুদৃশ্য হলঘরে। কাউকে বলে দেবার প্রয়োজন হতো না সেটি এক ধনী ব্যক্তির সাজানো ড্রইংরুম। পারিজাত আর মনসিজ বসেছিল একটি সোফায়। সামনের সিঙ্গল সোফায় অয়স্কান্ত। সে বরাবরই তার নিজস্ব মেজাজে থাকে। তার শখ শৌখিনতা তাকে অন্যদের থেকে আলাদা করার পক্ষে যথেষ্ট। পোষাক পরিচ্ছদেও জমিদারী ঠাঁট। সেদিন পরে এসেছিল সিল্কের চোস্তা, র'সিল্কের বেনিয়ান। আর কালোর ওপর মিহিকাজের জামিয়ার। পায়ে কালো সোয়েটের জরির কাজ করা নাগরা। গা থেকে ফরগেট-মীন্টের ভুরভুর গন্ধ।

পারিজাতের এসব নিয়ে তেমন কোন মাথাব্যথা ছিল না। কবি কবি স্বভাবের স্পস্ট বক্তা ছেলেটা অয়স্কান্তর বিলাস বৈভবকে পাত্তা না দিয়ে অন্য আলোচনায় ব্যস্ত ছিল। কিন্তু কমপ্লেক্সের চাবুকটা পড়ছিল মনসিজের গায়ে। সে স্বভাবতই বেশ সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল। ভাবছিল কতক্ষণে তটিনী এসে তার সামান্য উপহারটুকু নিয়ে ঘর ছাড়ার পারমিশান দেবে।

ইতিমধ্যে বেয়ারা এসে খবর দিয়ে গিয়েছিল তার দিদিমণি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই নামছে।

—এখনও পাঁচ মিনিট? অয়স্কান্ত বেয়ারাটাকে ডেকে বলেছিল, আমরা তোমার দিদিমণিকে অনেকবার দেখেছি। অতবেশী সাজগোজের দরকার নেই। চলে আসতে বল।

বলেই পকেট থেকে বার করেছিল রুপোর চ্যাপ্টা একটা কৌটো। ওয়াইন পাউচ।

পারিজাত আর মনসিজ গোঁড়া নয। মদ্যপানে নিজেদের আসক্তি না থাকলেও, তারা জানতো অয়স্কান্ত ঐ ব্যাপারটি বেশ ভালো ভাবেই রপ্ত করে নিয়েছে। ক্লাশেও মাঝে মধ্যে খেয়ে আসে। প্রথম প্রথম অনুযোগ উঠলেও পরে এসব নিয়ে আর কেউ মাথা ঘামাতো না। কিন্তু, ঐ দিন, আফটার অল একটা অসপিশ্যাস ডে। তটিনীর জন্মদিন। তায় সহপাঠিনীর পারলার। বাড়ির লোকেরা কেউ কিছু মনে করতেও পারতো।

স্পষ্টবাদি পারিজাতই আপত্তি তুলেছিল, সে কীরে, এখানে বসেও তুই ওসব খাবি নাকি?

—কেন? আপত্তি কোথায় এবং কার? আই থিংক, তটিনী ইজ নট সো কনজারভেটিভ।

—না কথাটা তা নয়। আসলে উই আর টিল আ স্টুডেণ্ট। আর মদ্যপানের ব্যাপারে সমাজ ঠিক এখনও অতটা উদার নয়।

—ডোণ্ট স্যে রাবিশ। মদ খেয়ে মাতলামি না করা পর্যন্ত ব্যাপারটা নিতান্তই একটা সামাজিক স্টেটাস। এনিওয়ে, তোরা তো টাচ্ করছিস না। লেট মী ফেস দ্য সিচুয়েসন অ্যালোন।

এরপর আর কথা থাকতে পারে না। ওরাও চুপ করে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে তটিনী এসে পড়েছিল। না, ক্লাশে যাওয়া তটিনী আর এ তটিনীর মধ্যে ফারাক প্রায় আসমান জমিন। ওকে লাগছিল রাজেন্দ্রানীর মতো। একে তো মারাত্মক রকমের সুন্দরী তায় সাজ আর প্রসাধনে তার মাত্রা গেছে বেড়ে। কিন্তু টোটাল সাজটাই ছিল রাবীন্দ্রিক ধাঁচে। ফিরোজা রঙের থ্রি কোয়াটার দামী ব্লাউজ আর ঐ রঙেরই শাড়ি। শাড়িটা সম্ভবত তসর বেনারসী। একরাশ খোলা চুল। সারা গায়ে কত যে হীরে মুক্তো। মনসিজ একবারের বেশী দুবার ওর দিক তাকায়নি। সে এক নিঃশব্দ প্রেমিক। এই রূপসীকে প্রেম নিবেদনের কোন বাতুলতাই তার মধ্যে ছিল না।

পারিজাত তো খোলা মনের ছেলে। মাঝে মাঝে প্রগলভও বটে। ফস্ করে বলে ফেলল, তটিনী, একটা ছুরি দিতে পার ?

খিল খিল শব্দে হাসির তরঙ্গ ছড়িয়ে তটিনী বলেছিল, আজ আমার জন্মদিন পারিজাত। তুমি কী খুন-খারাবি করতে চাও ?

— হ্যাঁ চাই। দগ্ধে মরার থেকে সেটাই হবে বেটার।

—তার মানে ?

—তোমার আটপৌরে রূপেই আমি তোমার প্রেমে ডগমগ। এখন রাজেন্দ্রানীকে দেখে মনে হচ্ছে এই সুন্দরীকে ঠিক মতো সম্মান আমি বোধহয় দিতে পারব না। তাই তোমার এই রূপ বুকে নিয়ে আমি শহীদ হতে চাই। যাবার আগে আমার শেষ কবিতা লিখে যাব।

আবার রিনঝিন শব্দে পারলারে ছড়িয়ে পড়ল হাসির তরঙ্গ।

—তুমি বেশ বানিয়ে বানিয়ে মেয়ে ভুলনো কথা বলতে পার পারিজাত।

—উহুঁ, বরং সত্যিকথা সহজ করে বলে দিতে আমার কোন জড়তা আসে না।

—বেশ বাবা বেশ। তোমাদের কাছে যখন এতই চক্ষুশূল তখন না হয় আমি পোষাকটা বদলে আসি।

পারিজাত যেন আঁৎকে উঠেছিল, না দেবী, খবরদার এ রূপ তুমি বিসর্জন দেবে না। বিসর্জনের প্রতিমাকে বড় অসহায় লাগে। আরে বাবা তোমাকে দেখার সুখ থেকেই বা তুমি আমাদের বঞ্চিত করবে কেন ? তায় নেমন্তন্ন করে ?

—বুঝেছি। তা মনসিজ, তুমি কিছু বলবে না?

উত্তরটা পারিজাতই দিয়েছিল, শামুক তার নিজের খোলসের মধ্যে গুটিয়ে গেছে। আর তুমি তো জানোই, ও কী রকম স্বভাব-লাজুক। তা, ও কী যেন উপহার এনেছে, তোমার জন্যে। সেটি গ্রহণ করে ওকে বরং রিলিফ দাও। ওর জড়ত্ব কাটুক।

সাগ্রহে তটিনী এগিয়ে গিয়ে ওর সামনে হাত পেতে দাঁড়িয়েছিল, দাও, কী দেবে?

—না, মানে,

—দেবার জন্যে যা এনেছ, সেগুলো কী না দিয়েই বাড়ি নিয়ে যেতে চাও? ওটি হবে না! দাও, কী এনেছ।

প্রায় কাঁপা কাঁপা হাতে মনসিজ সোফার আড়ালে রাখা ফুলের প্যাকেটটা তুলে নেয়। পকেট থেকে বার করে মোটামুটি দামী একটি পেন। তারপর সেগুলো এগিয়ে দিতে দিতে বলেছিল, তটিনী, তুমি তো জানোই আমি বড় গরীব। তাই,

ছোঁ মেরে মুখের কথা কেড়ে নিয়ে তটিনী বলেছিল, আর একদিনের জন্যেও তোমার মুখ থেকে এ ধরনের কোন কথা যেন না শুনি। তুমি কী এবং কেমন সেটা সম্ভবত তোমার থেকেও আমি ভালো জানি।

তারপর অত্যন্ত যত্ন করে সেগুলি টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখে। তটিনী, বলে পারিজাত উঠে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে পারফিউমের শিশিটা বার করে ওর হাতে ধরিয়ে দিতে দিতে বলেছিল, ফুলের মতো পবিত্র জিনিস দেবার কথা মাথায় আসেনি, তবে যে গন্ধটা তুমি খুব ভালবাস সেটাই যোগাড় করেছি। একটু মাখবে নাকি?

তটিনী হাসতে হাসতে বলেছিল, না, মহাশয়, গন্ধে গন্ধে গন্ধ কাটাকুটি হয়ে পাঁচমিশেল একটা গন্ধ পড়ে থাকে। আমার পাঁচমিশেলি কিছু ভাল লাগে না। পরে মাখব, কেমন?

—অ্যাজ ইউ প্লীজ।

—কিন্তু, তটিনী অয়স্কান্তর দিকে তাকিয়ে বলে, ও কী মৌনী নিয়েছে? একটাও কথা বলছে না। অ্যায় অয়স্কান্ত।

—উনি বোধ হয় সুরাপানে বিবশ, ফুট কাটে পারিজাত।

—ইউ শাটাপ্, অয়স্কান্ত নীচু ঘাড় তুলে সোজা তাকায়। তার দীর্ঘায়ত চোখের কোণে রক্তিমাভা, তুমি শালা বাচাল। একটাও কথা বলবে না। কখন কথা বলতে হয় আর কতক্ষণ চুপ করে থাকতে হয় সেটা আমি জানি।

তারপর হঠাৎই সে উঠে দাঁড়ায়। সারা ঘরে জ্বলতে থাকা অন্তত চোদ্দ-পনেরোটা নিওনের আলোয় চকচক করছিল অয়স্কান্তর ছফুট

চেহারাটা। জানুয়ারির ঠাণ্ডাতেও ওর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম চিকচিক করে উঠছিল। সে সোজা গিয়ে দাঁড়ায় তটিনীর কাছে। তার গায়ে তখন হুইস্কি আর পারফিউমের মিশেল গন্ধ। সামান্য একটু তলতলে অবস্থা।

—ডোণ্ট ক্রিয়েট এনি সীন অয়স্কান্ত। ফস্‌ করে যদি বাবা এসে পড়েন, আমায় খুব লজ্জায় পড়তে হবে।

—নো ডিয়ার। মদ খেলেও আমাকে মাতাল করা দুঃসাধ্য। এনিওয়ে, আমি একটা সামান্য কিছু এনেছিলাম তোমাকে দেবার জন্যে। সঙ্গে আমার দু-তিনটি কথা।

—কথা? বেশতো, ভ্রূ কোঁচকায় তটিনী, তবে, আমিও আজ তোমাদের নেমন্তন্ন করেছিলাম, শুধুমাত্র আমার জন্মদিনের জন্যে নয়। তোমাদের তিনজনকেই একটা বিশেষ কথা জানবাব জন্যে।

—বিশেষ কথা? অয়স্কান্ত একবার বিড়বিড় করে। তারপয় বাকী দুজনের দিকে একবার ঝলক দর্শন দিয়ে বলে, কিন্তু আমারও যে বিশেষ কিছু বলার ছিল।

—বেশ, আগে তোমারটাই বলে নাও।

গুড, ভেরী গুড।

ধীবে ধীরে অয়স্কান্ত পকেট থেকে একটা ছোট্ট লাল ভেলভেটের বাক্স বার করে, তারপর তটিনীর দিকে তাকিযে বলে, এক ঢিলে দু পাখি মাবা বলতে পার। নাহ! তার আগে দেখি এটা তোমাব আঙুলে জায়গা করে নিতে পারছে কিনা।

ভেলভেটের ছোট্ট বাক্স থেকে বেরিযে আসে একটা আংটি। হীরেব। ঘবের উজ্জ্বল আলোয় সেটা আরো চিকচিক করে উঠল। তটিনীর অনামিকায পরিযে দিতে দিতে বলল, তটিনী, ইউ নো দ্যাট আই লাভ ইউ। এটা আমার মা তৈরী করে রেখেছিলেন তাঁর ছেলের বউকে দেবাব জন্যে। আই ওয়াণ্ট টু ম্যারি ইউ। বলতে পার তোমার জন্মদিনে আমাদেব এনগেজমেণ্ট রিংটা তোমাব হাতে পরিযে দিলাম। নাউ ইউ ক্যান স্টার্ট ইওর টক।

অয়স্কান্ত তার চেয়ারে গিয়ে বসে পডে। ঘরে তখন অখণ্ড নীরবতা। মনসিজতো চিরদিনই চুপচাপ। অয়স্কান্তর নাটকীয় পর্যায শেষ হবার পব পারিজাতও কেমন যেন নির্বাক হয়ে থম্‌ মেরে বসে ছিল।

কয়েক সেকেণ্ড নীরবতার পর তটিনী একবার আংটি সমেত নিজের আঙুলটা চোখের সামনে তুলে ধরল। ছড়িয়ে পড়ছিল হীরের দ্যুতি।

তারপর বেশ ধীর স্বরে নিজের বক্তব্য শুরু করল, আগেই বলেছি, আমার এবারের জন্মদিনে তোমাদের আমন্ত্রণ একটা নিছক উপলক্ষ্য। কিন্তু কারণটা এবার, অন্তত অয়স্কান্তর একটু আগের কথাগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে আমার

বক্তব্য যে সময়োচিত সেটা তোমরা এখনই বুঝতে পারবে। বেছে বেছে তোমাদের তিনজনকে নেমন্তন্ন করার পেছনে একটা বিশেষ কারণ আছে। আমার বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা কম নয়, সেটা সবাই জান। কিন্তু আজ সেই বিশেষ দিন যে দিন আর কাউকে আমি আসতে বলিনি।

আবার কয়েক সেকেন্ডের একটা ছোট্ট নীরবতা কাটিয়ে তটিনী ফের শুরু করে, আমি জানি তোমরা তিনজনেই আমাকে ভালবাস।

ফস্ করে অয়স্কান্ত বলে, মাই গড, তাহলে ডুবে ডুবে তোমরাও ?

পারিজাত বলে উঠে, ভালবাসার অধিকার সবারই আছে। ওটা কী কারো একচেটিয়া ?

—ওয়েল, তটিনী তুমি তোমার বক্তব্য শেষ কর।

—হ্যাঁ অয়স্কান্ত, আমি আসল কথায় আসছি। তোমাদের তিনজনের মধ্যে অয়স্কান্ত তার ভালবাসার কথা জানাতে কখনো হোঁচট খায়নি। আর পারিজাত বোধহয় আমাকে নিয়ে গোটা পঞ্চাশেক কবিতাই লিখে ফেলেছে। আর জনে জনে লোক ডেকে শুনিয়েছে।

—ওটা আমার স্বভাব, কাণ্ট হেল্প।

—হ্যাঁ স্বভাব। এটা খানিকটা জিনের বৈশিষ্ট। আর প্রত্যেকেই জন্মায় বিশেষ বিশেষ কিছু স্বভাব নিয়ে যেটা সাধারণত চেঞ্জ করা যায় না। তারজন্যে আমি তোমায় কোন দোষারোপও করছি না। ঠিক তেমনি, মনসিজও তার নিজস্ব স্বভাবে ইনট্রোভার্ট। ও আমায় কোনদিও ওর ভালবাসার কথা জানায়নি। কিন্তু আমার প্রতি ওর দুর্বলতা আমি বুঝি। তাই না মনসিজ ?

কিছু না বলে মনসিজ কেবল মাথা নীচু করে বসে থাকে। তটিনী আবার তার বলা শুরু করে, তোমরা কে আমায় কতটা ভালবাস, কার ভালবাসা কতটা গভীর আমি সে সবের মধ্যে যাচ্ছি না। কিন্তু, যেহেতু এটা আমাকে কেন্দ্র করে, এবং সম্পূর্ণ আমার নিজস্ব ব্যাপার তাই আমার অভিমতটাই তোমাদের জানাচ্ছি। তোমাদের তিনজনের মধ্যে মাত্র একজনকেই আমার ভাবী স্বামী হিসেবে ভালবাসি বা পছন্দ করি। তার নাম আমি জানাতে পারি। যদি তোমরা বোল্ডলি ব্যাপারটাকে স্বীকার করে নাও। না নিলেও আমার কিছু করার নেই। আই উইল স্টিক অ্যাট মাই পয়েণ্ট আপটু লাস্ট।

তটিনী থামলে পারিজাত বলে, তোমার এই সহজ সরল এবং নিজের ভালোলাগার ওপর ডিটারমিনেশান আমার খুব ভালো লাগল। এর জন্য তোমার ওপর আমার শ্রদ্ধা ভালবাসা আরো বেড়ে গেল। অয়স্কান্ত তুমি কী বল ? মনসিজ, তুই কিছু বল।

মনসিজ কোন কথাই বলে না। অয়স্কান্ত একবার বাঁকা চোখে পারিজাতকে দেখে নিয়ে বলে, তটিনী, নাটক কোর না, যা বলার তাড়াতাড়ি বলে ফেল।

টেবিলের ওপর তিনটে কাগজের ছোট্ট পুরিয়া ছড়িয়ে দিয়ে তটিনী বলে, এই তিনটে পুরিয়ার মধ্যে মাত্র একজনেরই নাম আছে। তোমরা তিনজনেই একটা করে পুরিয়া তুলে তার নামটা জেনে নাও।

—তটিনী, তুমি কিন্তু আজ বড্ড বেশী নাটক করছ।

—হয়তো তাই অয়স্কান্ত, জীবনে কিছু নাটকের প্রয়োজন হয় বৈকি।

—বেশ, তাহলে নাটক দিয়েই শুরু হোক আজকের সন্ধ্যেটা, বলেই সে হাত বাড়ায় টেবিলের দিকে।

কিন্তু একটা সাদামাটা নাটকের টপ্ ক্ল্যাইম্যাক্সটা ঘটে গেল তখনই। অয়স্কান্তর হাত তখনো টেবিলে পেঁছয়নি। সহসাই দপ্ করে নিবে গেল সমস্ত ঘরের সব কটা জ্বলে থাকা আলো।

অন্ধকারেই শোনা গেল তটিনীর গলা, তোমরা কিন্তু কেউ এখনই কোন কাগজ তুলবে না। আমি দু তিন মিনিটের মধ্যেই আলোর ব্যবস্থা করছি। তারপরই তোলাতুলি।

তটিনী ঘর থেকে বেরিয়ে গেছিল। ফিরেছিল তিন মিনিট নয় পাঁচ মিনিট পর। পিছনে বেয়ারার হাতে ইমারজেন্সী লাইট সমেত। আলোয় দেখা গেল টেবিলের ওপর তিনটে পুরিয়া পড়ে আছে। অয়স্কান্ত সোফায় হেলান দিয়ে চোখ বুজে বসে আছে। পারিজাত সিগারেট টানছে। আর মনসিজ স্ট্যাচুর মতো নির্বিকার।

তটিনী সামনের আর একটা সিঙ্গল সোফায় বসতে বসতে বলল, লোড শেডিংটা বেশ কমে গিয়েছিল। কাল সন্ধ্যেবেলা হঠাৎই একবার আলো চলে গিয়েছিল। এরকম হবে জানলে এ ঘরেও আরো তিন চারটে ইমারজেন্সী রেখে দিতাম। স্যরি ফর মাই লেট। নাও তোমরা একটা একটা করে পুরিয়া খুলে দেখ।

তিনজনেই গড়িমসি চালে একটা করে পুরিয়া তুলে নিল। তিনজনেই তা দেখল। এবং তিনজনেই কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে চুপ করে বসে থাকল।

—কী হোল, তোমরা কিছু বলছ না কেন?

পারিজাতই প্রথম উঠে দাঁড়াল। একপা একপা করে এগিয়ে গেল অয়স্কান্তর দিকে। তারপর হাতটা এগিয়ে দিয়ে বলল, কনগ্র্যাচুলেশন। উইস ইউ বেস্ট অব লাক।

—হোয়াট? চিৎকার করে ওঠে তটিনী, কী বলছ তুমি পারিজাত?

—কেন? তোমার নির্বাচিত নাম যার, তাকে অভিনন্দন জানানো কী উচিত নয়?

—কী বলছ তুমি ? তোমার কাগজে কার নাম লেখা আছে ?

—কেন, অয়স্কান্ত ।

—রাবিশ, মনসিজ তোমার কাগজে ?

—ঐ একই নাম ।

—তোমারটায় নিশ্চয়ই তোমারই নাম লেখা আছে, বাঁকা বাঁকা ঢেউ খেলানো স্বরে তটিনী জিজ্ঞাসা করে, তাই না অয়স্কান্ত ?

সোফায় হেলান দেওয়া মাথাটা তুলতে তুলতে অয়স্কান্ত বলে, আমি এখনও খুলে দেখিনি। দুজনের যদি তাই উঠে থাকে তাহলে তোমার ডিক্লেয়ারেশন মতো এটাতেও ঐ একই নাম থাকবে ।

—অ্যাবসার্ড, গলা তুলে তটিনী বলতে থাকে, এ নাম আমি কখনোই লিখিনি। আমি লিখেছিলাম অন্য নাম।

—কিন্তু, পারিজাত বলে, এখানে তো স্পষ্ট অয়স্কান্তর নাম লেখা আছে।

—তাহলে ওটা জাল। অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে নামটা পাল্টে দেওয়া হয়েছে।

—তটিনী, বেশ গম্ভীর স্বরে এবার অয়স্কান্ত বলে, যেহেতু তিনটে কাগজেই আমার নাম লেখা আছে, তুমি কী ঘুরিয়ে আমাকেই দোষী সাব্যস্ত করছ ?

—কে দোষী কে নির্দোষ এসব জানার বিন্দুবিসর্গ ইচ্ছে আমার নেই। দেখি কাগজগুলো, বলে তিনজনের কাছ থেকে কাগজের টুকরো তিনটে প্রায় কেড়ে নিয়ে তটিনী ইমারজেন্সীর আলোয় কাগজ তিনটে মেলে ধরে। এবং অতীব বিস্ময়ে সে দেখে তিনটে কাগজেই অয়স্কান্তর নাম লেখা। তিনটেই তার নিজেরই হাতের লেখা। এবং তিনটে কাগজই তার ব্যক্তিগত প্যাডের ছেঁড়া অংশ।

—মাই গড !

—কী হোল তটিনী ? অয়স্কান্তর কণ্ঠে এবার শ্লেষ, জাল জোচ্চুরির কিছু পেলে ?

—না। আমারই হাতের লেখা প্যাডের কাগজ। বাট হাউ ?

—তোমার কথা কিছু বুঝতে পারছি না তটিনী, পারিজাতও সামান্য দোলায়িত চিত্তে বলে, ইজ দেয়ার এনিথিং রং ?

—হ্যাঁ, রং, রং, রং। আমার প্যাডের কাগজের তিনটে টুকরোয় আমি একজনেরই নাম লিখেছিলাম। অ্যান্ড দ্যাট ইজ মনসিজ চৌধুরী।

—কিন্তু ?

—বিশ্বাস করো পারিজাত। এর মধ্যে কোন দ্বিধা নেই। কোন কিন্তু

নেই। কোন মিথ্যাচার নেই। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেলাম আমারই হাতের লেখায় অয়স্কান্তর নাম সেখানে গেল কী ভাবে? অয়স্কান্ত?

—আমি কিন্ত আমার সোফাতেই বসেছিলাম। এবং আমি পি. সি. সরকারের ছাত্র নই। এনিওয়ে তুমি কী তোমার মত বদলাতে চাও?

—বদলানোর কোন প্রশ্ন নেই। মত এবং মন দুটোই আমার অনেক দিন থেকেই স্থির করা আছে। এখানে কোন্ রহস্যে আমার ছড়ানো কাগজগুলো বদল হয়ে গেল জানিনা, তবে তোমরা দুজনেই জেনে রাখ আই লাভ মনসিজ। আই উইল ম্যারি হিম। এ্যাণ্ড দ্যাট ইজ ফাইন্যাল।

হাতের আংটি খুলে অয়স্কান্তর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, কারো প্রেজেণ্ট ফেরৎ দেওয়াটা অশোভন। কিন্তু তুমি একটা লেজুড় জুড়ে দিয়েছিলে, যেটা অ্যাকসেপ্ট করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

অয়স্কান্ত উঠে দাঁড়ায়। তটিনীর কাছে এসে বলে, কাউকে কিছু দিলে আমি সেটা ফেরৎ নিইনা। তটিনী, তুমি আজ আমায় অপমান করলে, দুভাবে। তার একটা হচ্ছে আংটি ফেরৎ দেওয়া। আর একটা আমার নাম ওঠা সত্ত্বেও তুমি একটা ভ্যাগাবণ্ডের নাম নিয়ে নাটুকেপনা শুরু করে দিলে। গুড। তোমার অপমান আজ আমি গায়ে মেখেই চলে যাচ্ছি। তবে অয়স্কান্ত জীবনে যা চায় সেটা সে পেতে অভ্যস্ত শুধু এইটুকুই মনে রেখো।

চলেই যাচ্ছিল। হঠাৎ মনসিজের কাছে এসে দাঁড়ায়। তারপর কথা চিবোতে চিবোতে বলে, স্লাই ফকস। মিটমিটে ডেভিল। তুমি কিন্তু সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল কোনদিন দেখনি। গুড নাইট।

কারো উত্তর অনুরোধের প্রত্যাশা না করেই রাজকীয় ভঙ্গিমায় বারোই জানুয়ারির অপমান বুকে নিয়ে অয়স্কান্ত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

পারিজাত এক সময়ে উঠে এসে মনসিজের কাঁধে মৃদু চাপ দিয়ে বলে যায়, মনসিজ, আমি জানি তুই খুব ভালো ছেলে। কিন্তু বড় ইনট্রোভার্ট। তোরই তটিনীকে পাওয়া উচিত। নইলে তুই তো এক কদমও এগুতে পারবি না। কিন্তু বড় ভয় করছে রে। অয়স্কান্ত বড় দেমাকী আর হিংস্র স্বভাবের ছেলে। তোর না কোন ক্ষতি করে বসে।

পাহাড় আর জঙ্গল ঘেরা ছোট্ট নির্জন বাংলোয় বসেছিল ওরা তিনজন। পারিজাত আর তটিনী একদিকে। ডাইনিং টেবিলে থরে থরে সাজানো খাদ্যদ্রব্য। একটু আগেই সুরজ এসে পরিবেশন করে গেছে। ঠিক উল্টো-দিকের চেয়ারে মনসিজ একা। তার হাতে মেডিকেল জার্নাল। ড্রিংক্সের সঙ্গে সঙ্গে মুখের কাজটাও চলছিল সমান তালে। অবশ্য মনসিজের সব কিছুতেই মিতব্যয়িতা। আহারেও।

এ আব এক বারোই জানুয়ারি। মাঝে কেটে গেছে দশটা বছর। বি এস সি পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুবার পরই তটিনী আর মনসিজ বিয়ে করে। পারিজাত মধ্যে থেকে একাই সব কিছু দায়িত্ব পালন করেছিল। যে বারোই জানুয়ারি তটিনী ঘোষণা করে সে মনসিজকেই ভালবাসে, সেদিন থেকেই পারিজাত তটিনীকে অন্য চোখে দেখতে শুরু করে। কিন্তু অয়স্কান্ত তারপর থেকেই নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। সে এদের সংশ্রব ছেড়ে বিদেশে পাড়ি দেয়। এবং ভুলেও নিজের হোয়্যার অ্যাবাউট্স্ কাউকে জানায় না।

পারিজাতও বিয়ে করেছিল নিজেকে সম্পূর্ণভাবে পারিবারিক ব্যবসায়ে জুড়ে দেবার পর। কিন্তু তার বিয়েটা সুখের হয়নি। মাত্র দু বছরের ঘরকন্না। তারপরেই সব তছনছ। রিয়ার সঙ্গে পারিজাতের অ্যাডজাস্টমেণ্ট হয়নি। সেই থেকে সে একা। রিয়া অন্য একজনকে বিয়ে করে চলে গেছে।

এত কিছুর পরও তিন বন্ধুর মেলামেশার কোন খামতি ছিল না। এবং তটিনীর জন্মদিনে পারিজাতের নিমন্ত্রণ বাঁধা। বছর দুয়েক হ'ল মনসিজ চলে এসেছে এই প্রত্যন্ত নির্জনে। নিজের গবেষণার কাজে। গতবারের মতো এবারেও কিন্তু পারিজাত বারোই জানুয়ারিকে ভোলেনি। সেও যথারীতি এখানে চলে এসেছে। উঠেছে আধমাইলের মত দূরত্বে আর একটা বাংলোয়। পারিজাত এখানে এলে ঐ বাংলোতেই ওঠে। তটিনীর মানা করা সত্ত্বেও। হয়তো মনের গভীরে তটিনীকে নিয়ে তার কোন দুর্বলতা থাকলেও থাকতে পারে। হয়তো সেই কারণেই ওদের সঙ্গে একই বাংলোতে থাকতে রাজী হয় না সে। তটিনী বোঝে। তাই কোন পীড়াপীড়ি করে না।

বাইরে তখন রাতের অন্ধকার ঘন হচ্ছে। শীতটাও বেশ জাঁকিয়ে নেমেছে। ড্রিংকসের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে পারিজাত বলে, অয়স্কান্তর আর কোন খবর পাসনি তাই না মনসিজ?

মনসিজ জার্নালের পাতা ওল্টালেও তার ভ্রূর ভাজে একটা দুশ্চিন্তা লুকিয়ে ছিল। প্রায় অন্যমনস্কের সুরে সে বলল, তুই কিছু বলছিস পারি?

—অয়স্কান্তর কথা।

—না। আমাদের বিয়ের সময়ে ত্যকে চিঠি পাঠিয়েছিলাম। তার বাড়ি থেকে মেসেজ এসেছিল সে ভারতের বাইরে। কোথায়, সে কথা তার বাড়ির লোকেরাও জানে না। দ্যাখ, যে যোগাযোগ রাখতে চায় না, তাকে কখনও খুঁজে পাওয়া যায় না।

—হুঁ। বড় রাগী। দেমাকী আর একগুঁয়ে। বনেদি ঘরের চাল আর কি। তবে একটা ধাঁধাঁ আজও আমার কাছে সলভ্ হোল না।

তটিনী সল্টেড বাদাম মুখে ছড়াতে ছড়াতে বলল, কোন্ ধাঁধা?

—তোমরা ভুললেও আমি ভুলিনি। সেই নাম লেখা কাগজগুলো কী করে পাল্টে গেছিল?

তটিনী হেসে ওঠে।

—হাসছ যে বড়?

—ব্যাপারটা অয়স্কান্তর চালাকি হতে পারে। ছেলেমানুষি বলা যেতে পারে। আবার গোঁ বলা যায়। ও আমাকে চেয়েছিল। কতটা ভালবাসতো জানিনা। কারণ ওর কথা আমি কোনদিনও ভাবিনি। ও আমাকে কয়েকটা চিঠি দিয়েছিল ভালবাসার কথা জানিয়ে। তার উত্তরও আমি দিয়েছিলাম। যদিও অয়স্কান্ত আমার কাছে কিছু ভাঙেনি। কিন্তু আমার অনুমান, তার মধ্যে থেকে তিনখানা চিঠিতে ওর নাম লেখা অংশটুকু ও কেটে এনেছিল। তারপর অন্ধকারের সুযোগে, ঠিক জানিনা, তবে এটা আমার অনুমান। অয়স্কান্ত নিজের চাওয়াকে পাওয়ার জন্যে সব কিছুই করতে পারে।

—বেশ, তা না হয় হলো, কিন্তু ও জানলো কী করে যে তুমি ঐ প্রসেসে তোমার মনের কথা জানাবে? ওকে কী আগে কোন হিণ্ট্স্ দিয়েছিলে?

—নাহ্। ব্যাপারটা কেবল জানতো আমার একবন্ধু। তাকে তোমরাও চেনো। মঞ্জু বিশ্বাস। হয়তো সেই জানিয়ে দিয়েছিল।

—কিন্তু মঞ্জুর সঙ্গে অয়স্কান্তর তো কোন যোগাযোগই ছিল না।

—তুমি কী হলফ করে বলতে পার মঞ্জুর সঙ্গে অয়স্কান্তর একেবারেই কোন যোগসাজস ছিল না?

ঠোঁট ওল্টায় তটিনী। বলে, অয়স্কান্ত কথা বলবে মঞ্জুর মতো কালো-কুলো অতি সাধারণ ঘরের একটা মেয়ের সঙ্গে? কী জানি বাপু। আমার তো বিশ্বাস হয় না। তবে ওসব আলোচনা থাক। পাস্ট্ ইজ পাস্ট্।

—হুঁ, বলে পারিজাত একটু লম্বা গোছের সিপ্ করে ঘড়ির দিকে তাকায়। ঘড়ির কাঁটা প্রায় ন'টার কাছে। পাহাড়ি পথ। শীতের রাত। অল্পক্ষণের পথ হলেও কুয়াশা কাটিয়ে যেতে হবে। অবশ্য ওর নিজের গাড়ি না। গাড়ি মনসিজের। ড্রাইভারও তার।

—তটিনী, খাবার বাড়ো। নইলে রাত বেড়ে যাবে। বাট মনসিজ, তোর কী কিছু হয়েছে? একটু অফ্ মুড। এনিথিং রং?

—আমিও দিন দুয়েক হলো লক্ষ করছি, মন, তোমার বেমুড্ কেন? মনে হচ্ছে দিন দুয়েক তুমি গভীর কিছু ভাবছ?

দুরমনস্কতা থেকে ফিরে আসতে আসতে মনসিজ বলে, তোমাদের কথাটা বলিনি। তটিনীকেও না। আসলে—,

—আসলে কী? তটিনীর মুখে ব্যগ্রতা।

—আচ্ছা পারিজাত, তুই এখেনে কদিন হলো এসেছিস?

—ভুলে গেলি, এরি মধ্যে? আজ বৃহস্পতি। এসেছি গত রবিবার সকালে। অর্থাৎ এগারো দিন।

—ইয়েস এগারো দিন। এবং গত দশদিন ঠিক ভোর ছ'টায় কেউ একজন আমায় ফোন করছে।

—ভোর ছ'টায়?

—হ্যাঁ টিনী, তুমি মর্ণিং ওয়াকে বেরিয়ে যাও ঠিক সাড়ে পাঁচটায়। আর ফোন বাজছে জাস্ট অ্যাট সিক্স্। এক মিনিট আগেও নয়, পরেও নয়।

—কে করছে?

—প্রতিবারই তার পরিচয় জানতে চেয়েছিলাম। কিন্তু নাম জিজ্ঞাসা করলেই জানায় সে নাকি আমার হিতাকাঙ্ক্ষী।

এবার পারিজাত জিজ্ঞাসা করে, গলা চিনতে পারছিস না?

—ব্যাপারটা কী জানিস, আমাদের এদিকে তেমন কোন ফোনের হিড়িক নেই। ইদানীং মানে এই বছর দুয়েকের মধ্যে বেশ কিছু বাংলো আর একটা হোটেল তৈরী হয়েছে। সম্ভবত ওই জায়গাগুলোয় ফোনের কানেকশান এসে গেছে। যারা এই প্রায় নির্বান্ধব জায়গায় এসে আস্তানা গাড়ছে, তারা রহিস লোক। অতএব ফোন থাকতেই পারে। আর আমি গবেষক। ইনস্টিটিউট আমাকে এসটিডি লাইন দিয়েছে।

—এ ছাড়া আর কোথাও আছে কী?

—স্টেশনের কাছে একটা জেনারেল বুথ হয়েছে।

—অর্থাৎ যে ফোন করছে সে যেকোন জায়গা থেকেই করতে পারে?

—পারে।

—তার বক্তব্যটা কী?

—বক্তব্য?

মনসিজ ফের নীরব হয়ে যায়। তারপর আনমনে কিছু ভাবতে ভাবতে বলে, নাহ্, সে কথা এখনি তোদের বলা যায় না।

—সেকী? আমাকেও বলা যাবে না?

মনসিজ ম্লান হাসে, না টিনী, এমন কিছু কিছু কথা আছে যেটা স্বামী স্ত্রীর মধ্যেও গোপন থাকা ভালো।

—ওহ্, বলে তটিনী খাবারের প্লেট সাজাতে শুরু করে।

পারিজাত সিগারেট ধরায়।

—আবার সিগারেট ধরালে কেন? খাবার দিচ্ছি তো।

—আমার তার মধ্যেই হয়ে যাবে, তা মনসিজ, ফোনের বক্তব্য নয় নাই বললি, ছেলে না মেয়ে?

—সেটাও বুঝতে পারছি না। খুব ফেণ্ট আওয়াজ। বিট্ হাস্কি। মোটা গলার মেয়ে হতে পারে। সরু গলার ছেলেও হতে পারে।

—উদ্দেশ্য ?

—হিতাকাঙ্খীরা যা দেয়। উপদেশ। অ্যালার্ট করা।

—সাবধান করতে চাইছে ? কিছু ক্লেম করছে নাকি ?

—নাহ্।

মনসিজ চুপ করে যায়।

—তার মানে তুই এর বেশী আর কিছু বলবি না। ওয়েল, আর একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, কোন বিপদ আপদের সংকেত কী ?

মনসিজ আবার কিছু ভাবে। তারপর বলে, বলতে পারিস। একটা বিপদের আভাষ দিচ্ছে।

—কার বিপদ ?

—তোর আমার তটিনী, সবার।

—আমার ? আমি তো বছরে একবারই আসি। তাও দিন পনেরোর বেশী থাকি না। তাহলে আমার আবার কিসের বিপদ ? ব্যাপারটা ঠিক ভালো ঠেকছে না। আমাদের কিন্তু খুলে বলতে পারতিস।

—বলব। আর কয়েকটা দিন দেখি।

সেই সন্ধ্যায় আর কোন কথা হলো না। বাকী সন্ধ্যেটা কেমন যেন ম্রিয়মান হয়ে গেল। রাতের খাওয়া শেষ করে পারিজাত চলে গেল মনসিজের গাড়ি নিয়ে। কেবল যাবার সময় মনসিজ বলল, লেকভিউ পয়েন্টের কাছে একটু সাবধানে যাস।

—তার মানে ?

—জায়গাটা এমনিতেই নির্জন। তার ওপর লেক। অন্য দিকে ঘন জঙ্গল।

—গাড়ি তো আমি চালাই না। চালায় তোর ড্রাইভার। ওকেই বলে দে।

রাতে শুতে গিয়ে তটিনী একবার জিজ্ঞাসা করে, সত্যিই তুমি আমাকে পর্যন্ত বলবে না ?

মনসিজ ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। অথবা ঘুমের ভান করেছে।

—কাল কী আমি ফোনটা রিসিভ করব ? যদি আসে ?

এবারও কোন উত্তর আসে না মনসিজের দিক থেকে।

লেকভিউ পয়েন্টে পারিজাত পাগলের মতো এদিক ওদিক খোঁজাখুঁজির দৃষ্টি নিয়ে তটিনীকে খুঁজছিল। একটু আগেই, ঠিক পৌনে ছটায় তার ঘরের ফোনটা ঝনঝনিয়ে ওঠে। অতভোরে তার ওঠার অভ্যেস নেই। বিয়ের পরেও নয়। এখনও নয়। তার ওপর এখানে সে এসেছে ছুটি কাটাতে।

ইচ্ছে মতো ঘুমোতে যাবে। উঠবেও ইচ্ছে মত। স্বাস্থ্যোদ্ধারের কোন বাতিক তার নেই। ঘুমজড়ানো বিরক্তি নিয়ে সে ফোন তুলেছিল।

—পারিজাত সেন বলছেন ?

—হ্যাঁ, কিন্তু আপনি কে বলছেন ?

—আপনার অপরিচিত। তটিনী চৌধুরী তো আপনার বান্ধবী ?

চরম বিরক্তি নিয়ে পারিজাত বলে, তাতে আপনার কী ক্ষতি হয়েছে ?

—না, ক্ষতি এক্ষেত্রে তটিনী দেবীর হয়েছে।

—আপনার এ কথার অর্থ ?

—লেকভিউ পয়েন্টের মুখে, যেখান থেকে জঙ্গল শুরু হয়েছে, তটিনী দেবী সেখানে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

—তা উনি এতো ভোরে ওখানে গেলেন কেন ?

—উনি মর্নিং ওয়াক করতে রোজই এখানে আসেন।

—এতো খবর রাখেন, তাহলে এটা নিশ্চয়ই জানেন ওনার স্বামী এইখানেই আছেন।

—জানি, কিন্তু ওঁর বাড়ির ফোনটা সম্ভবত খারাপ। কেউ অ্যাটেন্ড করছেন না। আপনি শিগগিরই চলে আসুন, ঐ স্পটে।

এরপর পারিজাতের আর কিছু ভাবার অবসর ছিল না। সে ঝটিতি নিজের পোষাক পাল্টে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। ঘুমন্ত ড্রাইভারকে এই শীতের সকালে আর বিরক্ত করেনি।

—কিন্তু, নিজের মনেই বিড়বিড় করল পারিজাত, কোথায় তটিনী ? কই এদিক ওদিক কাউকেই তো দেখা যাচ্ছে না। আজ আবার কুয়াশাও গাঢ়। খুঁজতেও অসুবিধা হচ্ছে।

জঙ্গলের অপেক্ষাকৃত ফাঁকা দিকটায় ও তটিনীর নাম ধরে একবার ডাকল। কোন সাড়া না পেয়ে আরো খানিকটা এগিয়ে গিয়ে আরো জোরে তটিনী বলে চিৎকার করে উঠল। তারপরই, হঠাৎ মনে হ'ল, বিশাল ঝাউ গাছটার নীচে লাল গারমেন্ট পরা কেউ একজন ডিপ্ মিস্ট্ ভেদ করে তার দিকে ছুটতে ছুটতে আসছে। একটু ভিজিবল হতেই বোঝা গেল তটিনী দৌড়ে দৌড়ে তার দিকেই আসছে। পারিজাত দূরত্ব কমিয়ে কাছাকাছি এসেই জিজ্ঞাসা করল, কী হয়েছে তোমার তটিনী ?

আশ্চর্য হয়ে তটিনী জিজ্ঞাসা করে, তারমানে ? আমার আবার কী হবে ? মর্নিং ওয়াকে সবে বেরুতে যাব, হঠাৎ ফোন বেজে উঠল। কাল সন্ধ্যায় মনসিজের কথা মনে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ফোনটা ধরতেই ওপাশ থেকে কে যেন বলে উঠল, শিগগীর লেকভিউ পয়েন্টে চলে আসুন। আপনার বন্ধু পারিজাতকে বোধ হয় কেউ খুন করেছে।

—মাইগড্ ! পৌনে ছটায় আমাকেও কেউ একজন ফোন করেছিল। বলল, তুমি নাকি হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছ। তোমার বাড়ির ফোন ডেড্ বলে ও আমাকেই ফোন করেছে।

তটিনী খানিকক্ষণ পারিজাতের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলে, ষড়যন্ত্র, কেউ একজন আমাদের নিয়ে কোন গভীর ষড়যন্ত্রের খেলা খেলছে। রাত্রে মনসিজও বলছিল গত দশদিন সেও অদ্ভুত একটা ফোন পেয়ে আসছে। কিন্তু কে ? কে এই খেলা খেলছে ? তার উদ্দেশ্যই বা কী ?

গাড়ি চালাতে চালাতে মনসিজ একবার কোটের পকেটে হাত ঠেকিয়ে দেখে নিল পিস্তলটা ঠিক জায়গায় আছে কিনা ? গতকাল শুতে যাবার আগে ও অ্যালাম দিয়ে রেখেছিল ছটার ঘরে। অ্যালার্ম আর টেলিফোন দুটো একসঙ্গেই ঝাঁঝাঁ করে উঠেছিল। ফোন তুলে যথারীতি তটিনীর বিছানায় তাকিয়ে দেখে বিছানা শূন্য। তারপরেই সেই অদৃশ্য কণ্ঠস্বর, আমার কথা বিশ্বাস করতে পারনি মনসিজ চৌধুরী। হাতে নাতে প্রমাণ যদি পেতে চাও লেকভিউ পয়েণ্টের কাছে চলে যাও। যেখান থেকে জঙ্গল আরম্ভ হচ্ছে, সেখানে দেখবে জঙ্গলটা বেশ হাল্কা। নিজের গাড়িটা একটু দূরে রাখবে। পিস্তলটা সঙ্গে নিয়ে নিও। বেইমান বন্ধু আর পরপুরুষে আসক্ত রমণীর যা শাস্তি হওয়া উচিত সেটা নিজের হাতেই দিয়ে দাও। জায়গাটা খুব নির্জন। এ সুযোগ আর পাবে না।

কে, কী বৃত্তান্ত শোনার আগেই লাইন কেটে যায়। এবারও সেই একই কণ্ঠস্বর। ছেলে না মেয়ে বোঝার উপায় নেই। বোঝার মতো মানসিকতাও তার ছিল না। তার কেবল মনে হলো, প্রতিবছরই পারিজাত এখানে আসার পর থেকে তটিনীর মধ্যে বেশ কিছুটা পরিবর্তন শুরু হয়ে যায়। গল্প, হাসি, নানাধরনের কথাবার্তা অনেকটাই বেড়ে যায়। তটিনী তখন গৃহিনী নয়, হয়ে ওঠে প্রেমিকা। তার মানে, এখনও,

আয়রন চেস্ট্ খুলে পিস্তলটা বের করে নেয়। একটা গুলিও খরচ হয়নি। কে জানে, ঘটনা ঠিক হলে কটা গুলি খরচ হবে ? অন্তত দুটো বিশ্বাস হন্তার জন্যে দুটো তো বটেই।

বিশাল শাল গাছটার আড়ালে গাড়িটা দাঁড় করাতেই ওর চোখে পড়ল। যতই কুয়াশা থাক, তার চিনতে অসুবিধা হয় না, একটি নারী এবং একটি পুরুষ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

গাড়ি থেকে নেমে খানিকটা এগিয়ে যায়। হ্যাঁ, ঠিক তাই। তটিনী আর পারিজাত। দুজনেই হাসিতে ফেটে পড়ছে। মনসিজ দ্রুত পায়ে ওদের,

দিকে এগিয়ে যায় নিজেকে আড়াল রেখে। আর একটু। হ্যাঁ আর একটু। পারিজাত এখন তার পিস্তল রেঞ্জের মধ্যে।

মনসিজ শুনতে পেলো, তটিনী বলছে, তাহলে আর দেরী করা কেন? এসব ব্যাপার দেরী করা মানেই অন্য কিছু অঘটন ঘটে যাওয়া। অযথা অপেক্ষা করারও কোন মানে হয় না। আজই মনসিজকে সব খুলে বলি। তারপর,

চকিতে গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে মনসিজ। তার হাতে উদ্যত পিস্তল। শ্লেষের ভঙ্গীতে বলে ওঠে, থামলে কেন, বলে যাও তটিনী, বেশী দেরী হলে মনস্কামনা পূর্ণ না হওয়ার মতো অঘটন ঘটে যেতে পারে। অযথা অপেক্ষা করাও যুক্তিহীন। তবে সত্যিই দেরী হয়ে গেছে। পালাবার কোন রাস্তাও নেই। একমাত্র সন্তান ছাড়া আমি কিন্তু তোমাকে সবই দিয়েছিলাম টিনী। তারপর পারিজাতের দিকে ফিরে বলে, ছিঃ পারিজাত, তোকে যে আমি প্রচণ্ড বিশ্বাস করতাম। আমাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ঠকাতে পারলি?

পারিজাত চিৎকার করে ওঠে, কী পাগলের মতো আবোলতাবোল বকছিস মনসিজ?

—আমি পাগল কী তোরা দুজন ডেভিল সেটা পরকালে গিয়েই শুনবি।

কথা শেষ হবার আগেই মনসিজের পিস্তল গর্জে ওঠে। লুটিয়ে পড়ে পারিজাত। একবার নয় দুবার।

তটিনী চিৎকার করে কিছু বলতে চেয়েছিল, কিন্তু তার আগেই ভারী মোটা গলায় পুলিশি হুঙ্কার শোনা যায়, মনসিজ চৌধুরী, আর এগোবার চেষ্টা করবেন না। পুলিশ চারদিক থেকে আপনাকে ঘিরে ফেলেছে। তটিনী দেবী, আপনি পালান। উনি কিন্তু গুলি চালাতে পারেন।

কিছু ভাবার আগেই তটিনী এলোমেলো ছোটা শুরু করে। পিছনে মনসিজ। তার পিস্তল থেকে আওয়াজ ছোটে। কিন্তু ছুটন্ত মানুষকে গুলিবিদ্ধ করার মতো দক্ষতা না থাকায় গুলি এদিক ওদিক লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে থাকে।

সে মাত্র কয়েক কদম। তারপরই কাটা কলাগাছের মত হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায় মনসিজ চৌধুরী, পুলিশের অব্যর্থ নিশানায়। ক্যানসার রিসারচার মনসিজ চৌধুরী, যার নিজের মনের ঈর্ষার ক্যানসার তাকে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে। মাত্র দশ দিনেই।

পাশাপাশি দুটি চিতা জ্বলছে। মনসিজ আর পারিজাত। পারিজাতের গুলি লেগেছিল বুকে। আর মাথায়। স্পট্ ডেড্। আর মনসিজ বেঁচে

ছিল কিছুক্ষণ। হসপিট্যালে নিয়ে যাবার পর মিনিট দশেক চেষ্টার পরও তাকে বাঁচানো যায়নি। মনসিজের বুকের ওপর ঝুঁকে পরে তটিনী অনেক বারই জানতে চেয়েছিল সহজ সরল আত্মভোলা একটা মানুষ হঠাৎ কেন এমন একটা কাজ করে বসল। মনসিজ মুখে কিছু বলতে পারেনি। কেবল ইশারায় জানিয়েছিল সব কথা লেখা আছে তার ডায়েরিতে।

চিতার সামনে বসে থাকতে থাকতে সহসাই তার মনে হ'তে থাকল এ নিছকই মনসিজের পাগলামি নয়। একটা ফ্রেন্জিনেশ ওকে গ্রাস করেছিল। কিন্তু, কেন? এর অন্তরালে নিশ্চয় কোন কারণ আছে। আর সেই কারণটা কী? টেলিফোনে ও কার কণ্ঠস্বর? কিন্তু যারই কণ্ঠস্বর হোক সে বেশ পরিকল্পনা করেই কয়েক মিনিটের তফাতে তিনজনকে ফোন করে লেকভিউ পয়েন্টে আসতে বলেছিল। কিন্তু তার উদ্দেশ্য কী? আসলে সে কী তিনজনকেই প্ল্যান মাফিক পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল? সেটা হতে পারতো যদি মনসিজের গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট না হোত। বরাত জোরে সে বেঁচেছে। পুলিশও এক উড়ো ফোন পেয়ে ঠিক সময়ে ভিউ পয়েন্টে পৌঁছেছিল। অদৃশ্য কণ্ঠস্বর তাদের জানিয়েছিল, একটা খুনোখুনির ঘটনা ঘটতে চলেছে। তারা যেন খুনের মতো অঘটন ঘটার আগেই অকুস্থলে পৌঁছে যায়।

অজানা কণ্ঠস্বর তাকে বলেছিল পারিজাতের বিপদ। পারিজাতকে বলেছিল তটিনীর ভয়ংকর অসুস্থতা। আর মনসিজ? তার ডায়েরি না পড়লে জানা যাবে না অদৃশ্য আততায়ী তাকে কী বলে একই স্পটে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল।

এর অর্থ কী হতে পারে? আগাগোড়া চক্রান্তের জাল বুনে কোন একজন মানুষ তাদের তিনজনের মধ্যে শত্রুতার বাতাবরণ তৈরী করতে চেয়েছিল। কিন্তু এতে তার লাভ কী? তারা তিনজনেই যদি মরে যেত সেই অদৃশ্য কণ্ঠস্বরের মালিকের কোন্ বিশেষ উদ্দেশ্য সফল হোত?

আগুনের দাপাদাপির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সহসাই তার একটি বিশেষ দিনের কথা মনে পড়ে। দশ বছর আগে যে বারই জানুয়ারির রাত্রে অয়স্কান্তকে রিফিউজ করেছিল, সেদিন সে একটাই কথা বলেছিল, এক ঢিলে কী করে দুটো পাখি মারতে হয় সেটা আমি জানি। সে আরও বলেছিল, হারতে আমি জানি না। হার মেনে নেওয়ার মতো রক্তস্রোত আমার ধমনীতে বইছে না।

তবে কী অয়স্কান্তই? কিন্তু দশ বছরের মধ্যে অয়স্কান্তর সঙ্গে তার কোন যোগাযোগ নেই। এমন কী সে এখন ইণ্ডিয়ায় আছে কিনা তাও জানে না। তাছাড়া ইণ্ডিয়ায় থাকলেও সে তো নিজের হাতে কোন খুন

করেনি। একজন মরেছে মনসিজের পিস্তলে। সেও মরতে পারতো। আর একজন মরেছে পুলিশের গুলিতে।

তার এই অদ্ভূত ভাবনার পিছনে কোন যুক্তি নেই। কোন প্রমাণ নেই। নেই কোন সূত্র। এমন কী তার প্রতিহিংসা পরায়ণতার কোন নির্দ্দিষ্ট ভিত্তিভূমিও নেই। পুলিশকে জানালে তারা অমূলক ভাবনা বলে তার এফ আই আরটাই হয়তো নেবে না।

জ্বলন্ত চিতার ওপাশে গভীর অন্ধকার। মনসিজ আর পারিজাতের মৃত্যুর পিছনে যে গূঢ় রহস্য আছে সেটা ঐ চিতার পরের অন্ধকারের মতো ছিদ্রহীন।

এ এক গভীর রহস্য। খোলা মনে সে কখনোই মেনে নিতে পারছে না এটা কোন দুর্ঘটনা। আবার এ কারো তৈরী হত্যাকাণ্ড তারও কোন প্রমাণ নেই। ক্রমশ নিভে আসা চিতার সামনে দাঁড়িয়ে সে প্রতিজ্ঞা করে, আসল সত্যটাকে তাকে খুঁজে বার করতেই হবে। কিন্তু এখানে বসে তা সমাধান করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। ফিরে যেতে হবে কলকাতায়। তারপর—

* * *

আগে কালেভদ্রে একটু আধটু মদ্যপান করতো। তাও তিনবন্ধু একত্রিত হ'লে। অথবা কোন পার্টিতে গেলে। তাও নামমাত্র। কিন্তু ইদানীং তার মদ্যপান বেড়ে গেছে। প্রতি সন্ধ্যায় মনসিজের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে সে কখনও কাঁদে, কখনও বিড়বিড় করে, কখনও বেঁহুশ হয়ে যায়।

মনসিজের ডায়েরি থেকে আততায়ীকে খুঁজে বার করার মতো কিছুই পাওয়া যায়নি। মনসিজ মুখে বলেছিল দশ দিন ধরে কেউ একজন তাকে ফোন করে। কিন্তু ডায়েরি বলছে প্রায় বছর খানেক ধরে মাঝে মাঝেই একটি লোক অথবা স্ত্রীলোক তাকে ফোনে তটিনীর চরিত্রস্খলনের কাহিনী শোনাতো। সে নাকি আর একটি পুরুষের সঙ্গে প্রেমে লিপ্ত। মনসিজ লিখেছে, প্রথম প্রথম সে এই উড়ো ফোনে বিশ্বাস করেনি। কিন্তু বিশ্বাসের মূলে কেউ যদি বারবার সততার প্রশ্নে কুঠারাঘাত করে সেটা নিজের অজান্তেই কখন যেন সন্দেহের চারা হয়ে বাড়তে শুরু করে। শেষ দিনে, তার নিজের ফোন আসে ঠিক ভোর ছটায়। আর তার ঠিক আধঘণ্টা আগে ফোন আসে তটিনীর। ফোন পাবার সঙ্গে সঙ্গেই তটিনীর পাগলের মতো বেরিয়ে যাওয়াটা নাকি তার সন্দেহকে এক্সট্রিমে পেঁাছে দিয়েছিল। তাই সে পিস্তল নিয়েই বেরিয়ে ছিল ঘটনার সত্যাসত্য বিচার করতে।

হু হু করে কেঁদে ওঠে তটিনী। ছবির দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করতে থাকে, কেন একবারের জন্যেও তুমি ফোনের কথা আমায় শোনালে না। আমাকে বিশ্বাস করতে পারনি। পারলে দু দুটো তাজা প্রাণ অকালে

ঝরে যেতো না। বিশ্বাস করো মনসিজ, আমি আজও তোমাকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসিনি। কাউকে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড় করাতেও পারিনি। আমার একটাই আফশোষ আমি মা হতে পারিনি। সে দুঃখ, যে তোমাকে নিয়েই ভুলে ছিলাম। এখন আমি বাঁচব কী নিয়ে?

মদের গ্লাসটা আবার ভর্তি করে তটিনী ফিরে আসে নিজের সোফায়। সারাদিন তার প্র্যাকটিশ করেই কেটে যায় চেম্বারে। কিন্তু সন্ধ্যেটা কেবল নিজের। সন্ধ্যেটা তার মদের বোতল হাতে পাগলামির সময়।

মনসিজ চলে গেছে পাঁচ বছর। পারিজাত চলে গেছে পাঁচ বছর। কিন্তু স্মৃতি ক্রমশ দগ্ধিত হয়েছে গত পাঁচ বছর ধরে। রহস্য রহস্যই থেকে গেছে। এই পাঁচ বছরে অয়স্কান্তকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করেছে। বিলেতের ঠিকানা তার জানা নেই। কোচবিহারের ঠিকানাতে চিঠি লিখেও অয়স্কান্তর কোন হদিশ পাওয়া যায়নি।

হয়তো এমনি করে থাকতে থাকতে একদিন সে বুড়ি হয়ে যেতো অথবা লিভার অ্যাবসেসে মারাও যেতে পারতো। কিন্তু হঠাৎ একদিন সন্ধ্যের মুখে টেলিফোনটা বেজে উঠল। একরাশ বিরক্তিতে মুখের রেখাগুলো কুঁচকে উঠল। সন্ধ্যের পর সে কোন রোগী দেখে না। কারণ তখন তার ডাক্তারী বিদ্যে ফলাবার মতো জ্ঞানশক্তি প্রায় বিলুপ্ত।

ফোনটা বাজল আরো কোয়ার্টার মিনিটের মতো। শেষকালে বাধ্য হয়েই রিসিভার তুলতে হল, ডক্টর মিসেস চৌধুরী স্পিকিং?

হু দ্য হেল ইউ আর ডিসটার্বিং মী আফটার সিক্স?

এই ল্যাঙ্গুয়েজ সে কখনও ব্যবহার করে না। কিন্তু করল।

—এক্স্ট্রিমলি স্যরি ডক্, আয়াম হেল্পলেশ বাট টু মিট ইউ।

—হোয়াই? আর য়ু মাই পেসেন্ট?

—নো ম্যাডাম, বাট দিজ ইজ ভেরী এসেনসিয়াল অ্যান্ড আরজেন্ট। অ্যাট প্রেজেন্ট মাই পজিশান ইজ অ্যাট স্টেক্। অ্যাট লিস্ট্ আই ওয়ান্ট টু গিভ ইউ সাম্ ইমপর্টান্ট মেসেজ হুইচ উইল এনাবেল টু রিচ্ ইয়োর ডেস্টিনেশান।

ভ্রু কুঁচকে উঠল তটিনীর। ইন্দ্রিয় সজাগ হল। একটা হাস্কি ভয়েস। ঠিক এই রকমই একটা কণ্ঠস্বর তার কাছে এসেছিল। পাঁচ বছর আগে। মনে থাকার কথা নয়। তবু মনে রাখার বিশেষ কারণও আছে।

—হাউ কুড ইউ নো মাই রিয়েল ডেসটিনেশান?

—আই নো ডক। প্লীজ অ্যালাউ মী টু মিট ইউ।

তটিনী ভাবার জন্যে কিছুটা সময় নেয়। ওপাশ থেকে আবার কণ্ঠস্বর

ভেসে আসে, আই নো এভরিথিং অ্যাবাউট দ্য মিষ্টিরিয়াস এণ্ড অব ইয়োর হাজব্যাণ্ড অ্যাণ্ড নিয়ারেষ্ট ফ্রেণ্ড।

—আই সি। দেন ইউ মাস্ট কাম টু মাই প্লেস অ্যাট য়োর আরলিয়েস্ট পসিবিল টাইম।

*　　　*　　　*

মহিলাকে দেখে তটিনী একটু অবাক হ'ল। তিনি কেবলমাত্র দারুণ সুন্দরী বললে কম বলা হয়। সাড়ে পাঁচ ফুটের কিছু বেশী হবে হাইট। যুবতী শরীর কামনাকে উদ্বেল করে। পরনের হাল্কা গোলাপী শাড়ির প্রান্তদেশের সঙ্গে গায়ের রঙের তফাৎ করতে গেলে দৃষ্টিকে তীক্ষ্ন করে নিতে হয়। মডার্ণ প্রসাধনী আর উগ্র পারমিউমের গন্ধে তটিনীর সারা ঘর প্রায় প্যারিসের এসেন্স কারখানা। সঙ্গে একখানা হাত ব্যাগ ছাড়া কিছু নেই। কাঁধ পর্যন্ত ছাঁটা চুলের ঢেউ অশান্ত। মহিলা বারে বারেই কপালের ওপর নেমে আসা কুন্তলদাম সরাতে ব্যস্ত। হয়ত এটা ওর বিশেষ অভ্যাসের পরিণাম। তটিনী নিজেও সুন্দরী। তার সৌন্দর্যে আছে পরিমিতি। কিন্তু এ মহিলার সৌন্দর্য উগ্রতায় লাগামছাড়া।

—ইফ্ আয়াম নট রং, ইউ আর ডক্টর মিসেস তটিনী চৌধুরী।

—ইয়েস ইউ আর রাইট। হ্যাভ্ য়োর সিট প্লীজ।

সামনের সোফায় বসতে বসতে মহিলা বলে, আয়াম রোজি সেন।

—রোজি সেন, আ ফিল্ম্ অ্যাকট্রেস্, ইফ আই ডোণ্ট মেক এনি মিস্টেক ?

—হ্যাঁ তটিনী দেবী, ঠিক তাই। কারণ এ মুখ বাংলা মুম্বাই ফিল্মে সবাই চেনে।

—আমি অবশ্য সিনেমা গোয়ার নই। অ্যাটলীস্ট গত পাঁচ বছরে তো নয়ই।

—এখন ঘরে বসেই দেখা যায়। কোথাও যাবার তো দরকার নেই।

—স্যারি রোজি দেবী, আই হ্যাভ আ ভেরী লিটল্ টাইম টু এনজয় দ্য টিভি শোজ। এই তো দেখছেন, সারাদিন রোগী অ্যাটেণ্ড করা পর সন্ধ্যে বেলায় মদের গ্লাস নিয়ে বসেছি। অ্যাণ্ড, এটা চলবে যতক্ষণ না চোখের পাতায় ঘুম ভারী হয়ে চেপে বসছে। এনিওয়ে এবার বলুন আপনি হঠাৎ আমার কাছে কেন ?

—সে কথা তো আগেই বলেছি।

—বলেছেন মনসিজ আর পারিজাতের মিস্টিরিয়াস ডেথ সম্বন্ধে আপনি বিশেষ কোন সংবাদ দিতে পারবেন। সেটা কী ভাবে ? স্যারি, ডু ইউ হ্যাভ এনি প্র্যাকটিস অন হুইস্কি ?

—অ্যায়াম নট্ আ টিপিক্যাল হাউসকিপিং ওয়াইফ অব নাইনটিন্থ সেঞ্চুরী।

একটা গ্লাসে কিছুটা হুইস্কি ঢেলে ও রোজির দিকে এগিয়ে দেয়। প্রয়োজন মতো জল মিশিয়ে "চিয়ার্স" বলে গ্লাসে সিপ্ করে রোজি।

—এবার বলুন রোজি দেবী।

সামান্য কিছুটা সময় নিয়ে রোজি আচমকাই একটা প্রশ্ন করে ফেলে, অয়স্কান্ত রায়কে আপনি চেনেন?

—অয়স্কান্ত রায়কে আমি অনেক দিন ধরেই খুঁজছি। বাট আই ডিডণ্ট্ গেট এনি ট্রেস অব হিম। আয়াম ব্যাড্‌লি ইন নীড অব্ হিজ হোয়্যার অ্যাবাউট্‌স্।

—অয়স্কান্তকে আপনি ভীষণ করে খুজছেন? কেন?

—সে সব অনেক কথা। আমি কেবল জানতে চাই সে এখন কোথায়?

—এই কলকাতাতেই।

—কলকাতায়। মাই গড। হোয়্যার?

—অবশ্য এই মুহূর্তে সে কলকাতায় না মুম্বাইতে সেটা সঠিক বলতে পারব না। কারণ এই দুটো জায়গায় তাকে অহরহ যাতায়াত করতে হয়।

—ব্যবসায় জন্যে? নাকি অন্য কোন কারণে?

—অয়স্কান্ত রায়ের দ্বারা আর যাই হোক ব্যবসাটা হবে না।

—তাহলে?

রোজি সেন ব্যাগ থেকে একটা দামী বিলিতি সিগারেটের প্যাকেট খোলে। একটা তটিনীকে অফার করতে চায়।

—নো। আমি ডু নট স্মোক।

রোজি একটা সিগারেট ধরায়। একটু সময় নেয়। তারপর বলে,

—যদিও আমি রোজি সেন, র‍্যাদার ইউ ক্যান স্যে দিস ইজ মাই প্রফেশনাল নেম। ইণ্ডাষ্টিতে আমি ঐ নামেই পরিচিত। কিন্তু আমার অরিজিন্যাল নেম বর্ণা রায়। এক্স ওয়াইফ অব অয়স্কান্ত রায়।

—আই সী। আপনি তবে অয়স্কান্তর লাইফ পার্টনার ছিলেন?

—ছিলাম। বাট নট নাউ। অ্যাণ্ড আই ওয়াণ্ট টু গেট রিড অব হিম।

—কেন? হোয়াই সাচ্ আ সুইসাইডাল ডিসিশান অব ইউ? অবশ্য একান্ত ব্যক্তিগত মনে হলে বলার প্রয়োজন নেই।

—না। আমি সব কথা বলার জন্যেই আজ এখানে এসেছি। অয়স্কান্তর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ টোকিওর একটা স্টুডিওতে। তা ধরুন সেটা বছর আষ্টেকের কথা। তখন শ্যুটিং চলছে। আমার সেদিনের ভূমিকা ছিল

একজন লেডি ল-ইয়ারের। সওয়াল জবাবের সীন। লম্বা লম্বা ডায়লগ। ন্যাচারালি খুব স্ট্রেনাস জব। যাইহোক বেশ কয়েকবার এন. জির পর সীনটা টেক করা যখন শেষ হল, ডাইরেক্টর নিজেই সেদিনের মত প্যাক আপ করে দিলেন।

নিজের মেকাপরুমে বসে মেকাপ তুলছি। এমন সময় দরজায় নক্। খুলে দেখি প্রোডিউসার মিঃ লাখানিয়া আর সঙ্গে এক অপরিচিত যুবক। লাখানিয়া আলাপ করিয়ে দিলেন, ওনার বন্ধু পুত্র বলে। নাম অয়স্কান্ত রায়।

ফিল্ম লাইনে কাজ করতে করতে বহু সুদর্শন যুবকের সঙ্গে আমার পরিচয়, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু অন্তরঙ্গতাও হয়েছিল। আসলে যে লাইনে যা চলনরীতি। গা বাঁচিয়ে চলার চেষ্ঠা করলে গা তো বাঁচবেই না পরন্তু সেই গায়ে ফোস্কা পড়তে বেশী দিন লাগবে না।

কিন্তু প্রথম দর্শনে অয়স্কান্তকে দেখে আমার চোখে ঘোর লেগে গিয়েছিল। অস্বীকার করছি না, আমার মতো পোড় খাওয়া মেয়েও, ওই যাকে বলে লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট, আমার অবস্থা সেই রকমই। ছ ফুটের কাছাকাছি লম্বা, তেমনি স্বাস্থ্য, গায়ের রঙ উজ্বল রক্তিম। যেন টস্‌টস্‌ করছে। একটু টোকা দিলেই রক্ত ঠিকরে বেরুবে। আর ছিল ভুবন ভোলানো হাসি। কথা-বার্তা, চাল-চলন, সব মিলিয়ে একটি মেয়েকে বিবশ করার পক্ষে যথেষ্ট।

সে রাত্রে কী কী কথা হয়েছিল তা আমার আজ মনে নেই। আমি তখন একটা ঘোরে।

মনে আছে লাখানিয়া বলেছিলেন, অয়স্কান্ত রাজপুরুষের বংশধর। যেমন টাকা তেমনি দেমাক। তেমনি আভিজাত্য। আমার সেদিনের অভিনয়ে উনি নাকি মুগ্ধ হয়ে গেছেন। তাই আলাপ করতে এসেছেন।

তটিনী দেবী, এমন স্তাবকের দল আমার জীবনে নতুন কিছু নয়। অন্য যে কেউ হলে 'হাই হ্যালো'র ওপর দিয়েই আলাপের শুরু এবং শেষ হয়ে যেতো। কিন্তু কেন জানি না, অয়স্কান্তর সঙ্গে কথা বলার এবং আলাপ করার ঘোর আমাকে পেয়ে বসেছিল।

টোকিও-এ থাকতে থাকতেই ওর সঙ্গে আমার রোমান্স তৈরী হয়ে গেল। আমরা ঠিক করলাম বম্বে ফিরে গিয়ে বিয়ে করব।

রোজির একটানা কথার মাঝে তটিনী বাধা দিয়ে বলে ওঠে, বাট, রোজি দেবী, আমরা খবর পেয়েছিলাম অয়স্কান্ত বিলেত গেছে পড়তে। তা সে হঠাৎ টোকিওয়ে কেন?

—বিলেত ঠিক কোন্ দেশটা জানি না তবে ও তখন জাপানে। বলেছিল জাপান দেশটা দেখার ওর নাকি খুব ইচ্ছে। তাই ছুটি-ছাটায় ব্যবস্থা করেই ও টোকিও এসেছ।

—হঁ। তারপর ?

—আমার তখন মানসিক অবস্থা এমনি অয়স্কান্ত বললে আমি সব কিছু করতে পারতাম। ওর জন্যে আমি তখন প্রায় মাতাল। যাই হোক বম্বে ফেরার কথা যখন পাকা, সেই সময় একদিন বেশ করুণ করুণ মুখে অয়স্কান্ত এসে আমায় বলেছিল, আমার সঙ্গে সে বম্বে যেতে পারছে না।

মাথায় বাজ ভাঙ্গা অবস্থা। ইণ্ড্রাস্ট্রির সবাই জেনে গেছে। কাগজ নানা রকম গল্প ছড়াচ্ছে। কিছু কিছু কাগছে আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে এমন কথাও লিখে দিয়েছে। এ অবস্থায় তো ওকে ছেড়ে যাওয়াও সম্ভব না। মরিয়া হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কেন ডার্লিং, বম্বে না যাবার কী কোন জরুরী বাধা আছে ?

মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে ও আমায় বুঝিয়েছিল ওদের এস্টেট থেকে নিয়মিত টাকা আসছে না। ওকে প্রচুর অর্থনৈতিক অসুবিধা ফেস্ করতে হচ্ছে। তাই ও জাপান থেকে একটা ইলেকট্রনিকস্ কোম্পানীর এজেন্সী নিয়ে মিডল্ ইস্টে গিয়ে ব্যবসা শুরু করবে।

উত্তরে আমি বলেছিলাম, কিন্তু তোমার এস্টেট্ থেকে তো সেরকম কোন টাকাই পাচ্ছ না। তাহলে, তুমি যে ধরণের এজেন্সি নিয়ে ব্যবসা করার কথা ভাবছ তাতে তো প্রচুর টাকার দরকার।

ও বলেছিল, তাইতো ভাবছি ডার্লিং কী করে টাকা জোগাড় করা যায়।

—না পারলে ?

—ঘরের ছেলেকে ঘরেই ফিরে যেতে হবে।

—আমি তোমাকে একটা পরামর্শ দিতে পারি, শুনবে ?

—বর্ণা, আমার বাবা মা বড় সেকেলে। তোমাকে বিয়ে করলে আমাকে ফ্যামিলি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। তাতে আমার কোন আফশোষ নেই। বাট, আই নীড্ মনি। আই নীড্ আ জব। নিজের পায়ে না দাঁড়িয়ে বিয়ে করাটা, যতই তোমাব টাকা থাকুক। তাতে কী আমার প্রেস্টিজ থাকবে ?

ওর সেদিনের কথাগুলো শুনে আমার ভাবি ভাল লেগেছিল। মনে হয়েছিল এটাই তো পুরুষমানুষের মত কথা।

আমি একটা রাস্তা দেখিয়েছিলাম। অয়স্কান্ত চেহারায় শুধু রূপবান নয়, সুপুরুষ এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। বম্বের এক প্রোডিউসার তখন নতুন নায়ক খুঁজছিলেন। ওকে নিয়ে গিয়েছিলাম তার কাছে। অয়স্কান্তকে দেখে ওর পছন্দ হয়ে যায়। কিন্তু শেষ সময় ও প্রায় বেঁকে বসে। আমাকে জানায় ফিল্ম অ্যাকটিংয়ে ওর অনভিজ্ঞতার কথা। অনেক বুঝিয়ে সাহস দিয়ে ওকে শেষ পর্যন্ত সই করিয়েছিলাম। অবশ্য ছবিতে নামার আগে আমাদের রেজিস্ট্রিটাও হয়ে গিয়েছিল। তাই,

রোজি হঠাৎ থেমে গেল। তটিনী নেশা নেশা চোখে ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, থামলেন কেন? তারপর কী হল?

—টোট্যালি ফ্লপ। এবং আমি নিজেও বুঝতে পারছিলাম আর যাইহোক অয়স্কান্তর পক্ষে অভিনয় কোনদিন সম্ভব নয়। অন্য কেউ হলে এই আনসাকশেসের জন্যে মরমে মরে যেত। কিন্তু ওকে দেখে মনে হয়েছিল ও যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। মাঝ খান থেকে মদের মাত্রা বাড়িয়ে দিল। জুয়া আর রেসটাও সমান তালে চালিয়ে যেতে লাগল।

—তা, এসব খরচ জোগাতো কে?

—ছবিতে হিরো হওয়ার দৌলতে কিছু টাকা তো পেয়েছিলো। বাড়ি থেকে কিছু আসতো কিনা সেটা তখন জানতে পারিনি। পরে জেনেছিলাম সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। ও মাঝে মাঝেই বলতো ওদের বংশ নাকি ঐতিহাসিক বংশ। এবং বর্তমানে খুবই কনজারভেটিভ। রায় বংশের ছেলে হিন্দী সিনেমার হিরো হয়েছে এটা নাকি ওর বাবা মেনে নিতে পারেননি। কতটা সত্যি কতটা মিথ্যে জানিনা। সে যাই হোক, ওড়ানো যার স্বভাব তার হাতে টাকা কতদিনই বা থাববে? আমার ওপর চাপ সৃষ্টি করতে লাগলো। আসলে,

—আসলে?

—আমি অয়স্কান্তকে তখনও ভালবাসি। তাই ওর সব অপরাধই ক্ষমা করে ওকে নতুন করে কিছুতে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করলাম। মাঝে একবার ব্যবসা করার জন্যেও ইনভেস্ট করেছিলাম। পারেনি। আইড্‌ল্ অ্যান্ড হামবাগ লোকেরা কোনদিনই কিছু করতে পারেনা। শেষকালে কোন উপায় না দেখে ওকে আমার সেক্রেটারির জায়গায় নিয়ে গেলাম। তেমন কোন কাজ নয়। আমার সিডিউল দেখে ও প্রোডিউসারদের সঙ্গে কথা বলবে, ডেট দেবে, আমার কাছ থেকে জেনে নিয়ে কনট্র্যাক্ট অ্যামাউণ্ট সেট্‌ল্ করবে। এই ভেবেই ওকে আমি ম্যানেজারের পোস্টে নিয়ে গিয়েছিলাম যাতে ওর মধ্যে নিরোজগারির কোন কমপ্লেক্স না গ্রো করে। কিন্তু ও যে আমাকে প্রায় পথে বসিয়ে দেবে সেটা ভাবতেও পারিনি।

—পথে বসিয়ে দেবে একথার অর্থ?

—ডেট্ না থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন প্রোডিউসারকে ডেট্ দিয়ে মোটা টাকা অ্যাডভান্স নিয়ে নিতো। প্রথম প্রথম জানতে পারিনি। তারপর একদিন পেলাম কোর্টের সমন। ডেট্ থাকা সত্ত্বেও তাদের শ্যুটিং-এ আমি যাইনি। আর এর নীট্ ফল অ্যাডভ্যান্স সমেত খেসারত হিসেবে লক্ষ লক্ষ টাকা গুণগার দেওয়া।

—অয়স্কান্তকে কিছু বললেন না?

—কোথায় সে? সে তখন তিন 'ম'-এ অ্যাডিকটেড্। হ্যাঁ, সেদিনই জানতে পারলাম, মদ মাঠ ছাড়াও অয়স্কান্ত অন্য মেয়েদের নিয়ে স্ফুর্তিতে ব্যস্ত। আমার সমস্ত ভালবাসার তখন স্বপ্নভঙ্গ। দুধকলা দিয়ে কালসাপ পুষেছিলাম। সেটা তখনই আমাকে ছোবল দিতে শুরু করেছে। ডিসিশান আমি নিয়ে নিয়েছিলাম। ডিভোর্স স্যুট ফাইল করলাম ওর এগেন্স্টে। জানতাম এর জন্যে আমাকে বেশ কিছু টাকা খেসারত দিতে হবে। এত সহজে ও আমাকে রেহাই দেবে না। কিন্তু ওর ভেতরে যে আরো বড়ো একটা শয়তান খেলা করছে সেটা জানতাম না। উকিলের চিঠি পেয়ে ও আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। ওর সেদিনের কথাগুলো পরের পর আজও আমার মনে আছে। প্রথমেই ও জিজ্ঞাসা করেছিলো, উকিলের চিঠির অর্থ কী?

—কেন, তুমি কী লেখাপড়া জানোনা? ইংরেজির বাংলা তর্জমা করে দিতে হবে নাকি?

—অ্যালিগেশান?

—ভাল করে চিঠিটা পড়লেই পেয়ে যাবে।

—ওগুলো কোন যুক্তিই নয়। মদ খাওয়া কী রেস খেলা পুরুষ মানুষের বিরাট কোন চারিত্রিক স্খলন নয়। আর মেয়েছেলে? ওটা আমার পূর্বপুরুষের রক্তের ধারা। ওসব দিয়ে ডিভোর্স পাওয়া যায় না।

—তাহলে কী দিলে পাওয়া যাবে? টাকা?

—টাকা তো কিছু লাগবেই। নইলে তো দিবানা হয়ে যেতে হবে। কিন্তু তার থেকে একটা বড় কাজ করে দিতে হবে।

—কী রকম?

—কাজটা খুব সহজ। আর এই সহজ কাজটা করে দিলে তোমার মুক্তি। এবং আমারও। কারণ তোমাকেও আমার আর ভালো লাগছেনা। কোন মেয়ের দাসত্ব করা আর তাকে প্রতিটি কাজের কৈফিয়ৎ দেওয়া আমার জন্মকোষ্ঠিতে লেখা নেই।

—স্পষ্ট করে বল অয়স্কান্ত, তুমি কী চাও?

—বলছি। তবে তার আগে বলি, এই কাজটার ওপর নির্ভর করছে আমার একটা প্রতিশোধ নেওয়া। একটি মেয়ে একদিন আমাকে অপমান করেছিল। তাকে সেদিন আমি বলে এসেছিলাম, অয়স্কান্ত জীবনে যা চেয়েছে বা চায় সেটা সে পায়। পেতে অভ্যস্থ।

—তুমি কী আবার কোন মেয়ের ক্ষতি করতে চাইছ?

—দ্যাট্স নান অব ইওর বিজনেস। ওটা সম্পূর্ণ আমার ব্যক্তিগত প্রবলেম। এখন বল কাজটা করবে কিনা। কাজটা শেষ হলেই তোমার ডিভোর্স পেপারে সাইন করব। সঙ্গে লাখ দশেক টাকা ক্যাশ। এগ্রি?

কয়েক সেকেণ্ডের মত থামল রোজি। গ্লাসে ছোট্ট করে একটা চুমুক দিয়ে বলল, ডাক্তার চৌধুরী, সেদিন আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে গিয়েছিল। একবার মনে হয়েছিল এই ধরনের শয়তানকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে না দিলে আরো অনেকের ক্ষতি। অয়স্কান্তকে সরানো আমার বাঁ হাতের খেলা। কিন্তু পারিনি। অভিনয় করলেও জীবনের ক্ষেত্রে অভিনয় করতে পারিনি। সম্ভবত এটাই আমার দুর্বলতা। মেয়েদের দুর্বলতা।

রাত বাড়ছিল। তটিনীর মগজেও তখন রঙীন ফেনার বুদবুদ। একবার হাত ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে তটিনী বলে, অয়স্কান্ত কী কাজ করতে বলেছিল আপনাকে ?

—কয়েকটা ফোন। হাস্কি গলায় এক ভদ্রলোককে তার স্ত্রীর ওপর মন বিষিয়ে দেবার মতো কয়েক লাইনের কয়েকটা বাক্য পেঁছে দেওয়া।

চমকে ওঠে তটিনী। হাস্কি ভয়েস, মহিলা অথবা পুরুষ কণ্ঠের বিভ্রম যেন কাটছিল। ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞাসা করল, ভদ্রলোকের নাম কী ?

—আমাকে জানানো হয়নি।

—তারপর ?

—তারপর একদিন, ভোর সাড়ে পাঁচটা থেকে ছটার মধ্যে চার জায়গায় ফোন করতে হয়।

—চার জায়গা ?

—হ্যাঁ, ডায়ালটা ওই করে দিত এবং কথাগুলো আমায় বলতে হত। প্রথমে ছিলেন এক ভদ্রলোক। ঠিক সাড়ে পাঁচটায় তাকে জানানো হয় তটিনী নামে কোন এক মহিলা লেকভিউ পয়েণ্ট বলে একটা জায়গায় খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাকে তখনই বাঁচানোর জন্যে ঐ ভদ্রলোককে স্পটে যেতে বলা হয়।

—আই সী, বলে তটিনী ঘাড় দোলাতে থাকে। একটু পরে বলে, সেকেণ্ডম্যান ?

—ম্যান নয়। লেডি। অ্যাণ্ড আই থিঙ্ক দ্যাট ওয়াজ ইউ। আপনাকে বলতে বলা হয় পারিজাত নামে এক ভদ্রলোক ঐ লেকভিউ পয়েণ্টে গাড়ি অ্যাকসিডেণ্ট করেছেন।

—ইয়েস, আই ওয়াজ দ্যাট তটিনী চৌধুরী। পারিজাতের অ্যাকসিডেণ্টের খবর পেয়ে আমি ওখানে ছুটে গেছিলাম।

—অ্যাণ্ড থার্ড ফোন ফর দ্য ফরমার ওয়ান। যাকে বেশ কিছুদিন যাবৎ তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে তাতিয়ে তোলা হচ্ছিল।

—সেদিন আপনি কী বলেছিলেন মনে আছে ?

—আছে। বলেছিলাম, আপনার স্ত্রী আর তার প্রেমিকাকে হাতেনাতে

ধরতে চাইলে লেকভিউ পয়েণ্টে চলে যেতে। প্রয়োজনে পিস্তল ব্যবহারের কথাটাও কানের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

—আর চতুর্থ ফোনটা ?

—পুলিশকে জানানো হয়েছিল লেকভিউ পয়েণ্টে একটা খুনের ষড়যন্ত্র চলছে। পুলিশ দেরী করে গেলে খুনটা হয়ে যেতে পারে।

তটিনী দু আঙ্গুলে দুটো রগ টিপে বসে থাকলো খানিকক্ষণ। তারপর এক সময় মুখ তুলে বলল, প্রিমেডিটেটেড অ্যাণ্ড কুলব্রেনড মার্ডার। নিখুঁত হত্যার পরিকল্পনা। অথচ নিজের হাতে সে একটাও খুন করেনি। বোকা মনসিজ খুন করল নিরীহ পারিজাতকে। আমাকেও মারতে চেয়েছিল মনসিজ। পারল না। তার আগেই সে খুন হয়ে গেল পুলিশের গুলিতে। কী মাস্টার প্ল্যান। ম্যাডাম সেন আপনাকে অনেক, অনেক ধন্যবাদ। এই সব কিছু জানার জন্যেই আমার প্রতীক্ষা। কিন্তু এতদিন পর কেন ? কেন আপনি পুলিশে তখনই সব কিছু জানালেন না ? আপনি তো নিজেও জানতেন আপনি একটা ষড়যন্ত্রের পার্টনার হয়ে যাচ্ছেন।

তটিনীকে থামিয়ে দিয়ে রোজি বলে, না ডক, একটা অপরাধ ঘটতে চলেছে সেটা সামান্য অনুমান করেছিলাম। কিন্তু সেটা যে মার্ডার পর্যন্ত এগুবে তা বুঝিনি। আসলে তখন আমি ঐ শয়তানটার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার কথাই ভাবছিলাম বেশী করে।

—তাহলে আজ হঠাৎ, এতদিন পর আমার কাছে এলেন কেন ?

—ব্ল্যাকমেলিংটা যে একবার রপ্ত করে নিতে পারে তার স্বভাবটা মানুষের রক্তের স্বাদ পাওয়া বাঘের মতো হয়ে যায়। ও একটা কথা প্রায়ই বলতো, রাজা রাজবল্লভের বংশধর নাকি ওরাই। কিন্তু ইতিহাস বলে, রাজবল্লভ, জগৎশেঠ এরা স্বার্থপর এবং বিশ্বাসঘাতকের দলভুক্ত। তা সত্যিই যদি ও সেই বংশের রক্তধারার কেউ হয় তাহলে ওর রক্তে বিশ্বাসহীনতার প্রভাব পড়বেই। অয়স্কান্ত আবার এসেছে।

—কেন ? সেদিন ডির্ভোস পেপারে সই করেনি ?

—করেছে।

—তাহলে আবার আসার কারণ ? দেনা পাওনাতো সব মিটে গেছিল।

—আমি একটা বড় ক্রাইম করেছি। আমারই হুমকি ফোনের কথামতো দুজন মানুষের প্রাণ গেছে এটা প্রমাণ করতে নাকি ওর বেশী সময় লাগবে না।

—এবারে ওর ডিমাণ্ড কী ?

—টাকা।

—দেবেন বলেছেন ?

—সে প্রশ্নই ওঠে না।

—তাহলে কী করবেন ?

—ও জানে না, আণ্ডার ওয়ার্ল্ডের কিছু পোষা গুণ্ডা আমাকে বেশ খাতির করে। এখনও বলিউডের এক নম্বরে থাকা নায়িকাকে বাজার রাখতে গিয়ে কিছু নটোরিয়াস লোককে মাসিক ভাড়া দিতে হয়। ম্যাডাম সেনকে এবার হয়তো ঐ পথেই যেতে হবে।

—হুঁ। এবার বলুন তো, আপনি আমার কাছে সব কিছু কনফেস করলেন কেন ?

—একটা সরাসরি প্রশ্ন করতে।

—কী সেটা ?

—অয়স্কান্তকে পৃথিবী থেকে সরে যেতে হবে। এই সুন্দর গ্রহটায় ওর মতো ইনভার্টিব্রেট অ্যান্ড ডার্টি বীস্ট্‌দের আর থাকতে দেওয়া যায় না।

—কিন্তু আইন নিজের হাতে নেওয়া কী উচিত হবে ?

—এসব সিনেমাটিক ডায়লগ অনেকবার মুখস্ত বলে গেছি।

—বেশ, আপনার যা ভালো মনে হয় করবেন ?

—অর্থাৎ আপনার স্বামী এবং প্রিয়বন্ধুর মৃত্যুশোক আপনি ভুলে গেছেন ?

ম্লান হাসে তটিনী। তারপর বলে, ডাক্তার হলেও আমি একজন মহিলা। আমার শক্তি সীমিত। তাছাড়া আপনার ইনফ্লুয়েন্স অনেক বেশী, আমার থেকে। অয়স্কান্তর মতো দুর্দান্ত লোককে ট্যাক্‌ল করা আমার পক্ষে কী সম্ভব ?

—ওয়েল, দেন আই উইল হ্যাভ টু রীচ মাই গোল।

রোজি সেন চলে যাচ্ছিল, ঘুরে দাঁড়ায়। বলে, আমি আপনার কাছে এসেছিলাম এটা কেউ না জানলেই ভালো হয়। তবে জানলেও তেমন কিছু ক্ষতি হবে না। অয়স্কান্তর আর বাঁচা উচিত নয়, এই সত্যটা নিশ্চই আপনিও উপলব্ধি করছেন। অয়স্কান্তকে বাঁচানো বোধহয় কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

রোজি তখন প্রায় চৌকাঠের কাছে। তটিনী প্রশ্ন ছোড়ে, অয়স্কান্ত এখন কোথায় ?

—সম্ভবত তার পৈত্রিক ডেরায়। খুব শিগগীরই টাকার জন্যে আসবে আমার কাছে।

* * *

—জীবনে আমি কোনদিনও হারিনি। হারতে ভালবাসিনা। জেতার জন্যে আমি সব কিছু করতে পারি।

ঠোঁটের কোণে অবজ্ঞার সূক্ষ্ম হাসিটা ফুটে ওঠে তটিনীর। মদের গ্লাসটা নামিয়ে রাখতে রাখতে আরো একবার মনে মনে আওড়ায় অয়স্কান্তর দাম্ভিক শেষ কথাগুলো।

—না অয়স্কান্ত, নিজের মনেই বিড়বিড় করতে থাকে তটিনী, মেয়েদের তুমি চেনো না তাই বলতে পেরেছিলে জীবনে কোনদিন হারিনি। হারতে ভালবাস না। দুটো নিরীহ মানুষকে কৌশলে হত্যা করে জীবনে জেতা যায় না। তুমি নিজেই জানো না তুমি কবেই হেরে বসে আছো। আত্মিক মৃত্যু তোমার ঘটে গেছে, এবার ঐ নোংরা চরিত্রের দেহটা, আর কেউ নয়, রোজি সেনও নয়, তার আগে আমার কাছেই সেটা বলি দিতে হবে।

অনেক দিনের পুরনো টেলিফোন নাম্বার লেখা খাতাটা খুঁজে পেয়েছে। খুঁজে পাওয়া গেলো অয়স্কান্তর নাম্বার। জানে বর্তমানে এ নাম্বারে ডায়াল করলে একটা মেটালিক ভয়েস ভেসে উঠবে, দিস টেলিফোন নাম্বার ইউ হ্যাভ ডায়ালড্ ডাজ নট এগজিস্ট···ইত্যাদি। তটিনী জানে কোন্ নাম্বার ডায়াল করলে নিউ নাম্বারের হদিশ পাওয়া যাবে। সে তাই করে। এবং পেয়ে যায় বর্তমান সেভেন ডিজিট ফিগার। নব টেপার আগে কি যেন চিন্তা করে। তারপর ধীরে ধীরে শেষ ডিজিট পর্যন্ত টিপে যায়। রিং হতে থাকে। বার চারেক রিং হবার পর ভেসে আসে এক মহিলা কণ্ঠ, হ্যালো, কাকে চান?

—অয়স্কান্ত রায় আছেন?

—না, উনি তো এখনো ফেরেননি।

তটিনী ঘড়ির দিকে তাকায়। রাত নটা। তটিনী ভেবেই রেখেছিল এই কুমারী রাতে অয়স্কান্তর না থাকার সম্ভাবনাই বেশী।

—কখন ফিরবেন তা কী বলতে পারবেন?

—না। তার ফেরার কোন সময় অসময় নেই। আপনার নামটা কী বলবেন? মহিলার কণ্ঠে কিছুটা বিরক্তি, যদি কোন মেসেজ থাকে দিয়ে দিতে পারি।

তটিনী সামান্য সময় নিয়ে কিছু ভাবে। তারপর বলে, উনি ফিরলে বলবেন ডাক্তার তটিনী চৌধুরী একটা রিং ব্যাক করতে বলেছেন।

—ঠিক আছে। এনিথিং মোর?

—না। আপনার নামটা জানতে পারি?

—স্যরি। ইট উইল ডু নাথিং মোর টু ইউ।

বলেই ওপাশের মহিলা ফোন নামিয়ে রাখে। তটিনী হাসে। এ কী অয়স্কান্তর কোন নতুন শিকার? তাই জন্যেই কী নাম জানালো না? মনে মনে ভাবলো, দূর ছাই, যেই হোক তার নাম বা পরিচয় জেনে তটিনীর

কোন লাভ নেই। তার দরকার অয়স্কান্তকে। এবং সেটা রোজি সেনের আগেই।

রাত এগারোটায় তটিনী শুয়ে পড়ে। এবং তখন তার দেহ প্রায় নিস্তেজ। ইদানীং তার মাত্রা অনেক বেড়ে গেছে। গুণময় বলে বহুদিনের এক চাকর আছে। মনসিজের আমল থেকেই। গুণময় অনেক করে বারণ করে তার বৌদিমণিকে অত মদ না খাওয়ার জন্যে। তটিনী ধমকে তাকে ঘর থেকে বার করে দেয়।

অয়স্কান্তকে ফোনে না পাবার পর আশায় আশায় আজ একটু বেশীই খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। ভার ভার মাথা নিয়ে সবে বালিশে মাথা এলিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে কর্ডলেসটা বেজে উঠল। কর্ডলেসটা ওর বিছানাতেই পড়ে থাকে। জড়ানো ক্লান্ত গলায় বলে, হ্যালো।

ওপাশ থেকেও ভারী এবং জড়ানো কণ্ঠস্বর, আমি কী ডাক্তার মিসেস তটিনী চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলছি ?

—ওনলি ডাক্তার তটিনী চৌধুরী। নট্ মিস অর মিসেস। ইফ আয়াম নট রং, তুমি অয়স্কান্ত।

—ওহ্ গড্। তাহলে এতদিনে ঈশ্বর আমার দিকে মুখ তুলে চাইলেন ?

—ঈশ্বর টিশ্বর মানো নাকি ? আগে তো মানতে না।

—কাল আর আজ কখনো এক থাকেনা তটিনী।

—কিন্তু কালের কিছু ছায়া বোধ হয় থেকে যায়। অনেক সময় হুবহু ঘটনাও ঘটে যায়। হিষ্ট্রি রিপিট্স্ ইটসেলফ্।

—এটা তো আমার পক্ষে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখানোর কথা হয়ে যাচ্ছে।

—কেন, তুমি কী এখন বেঁচে নেই।

মাত্র দু সেকেণ্ডের বিরতির অবকাশ কাটিয়ে অয়স্কান্ত বলে, জীবনে আমি কোন দিন হারিনি, হারতে শিখিনি। হারতে ভালবাসিনা। কিন্তু এখনও জিতিনি। অন্তত একটা ক্ষেত্রে। তাই বোধ হয় বেঁচে নেই।

—তুমি একবার ফিল্মে হিরো হয়েছিলে। সেটা কিন্তু টোট্যালি ফ্লপ্‌ড্।

—ইট ওয়াজ নট্ মাই ফল্ট্। প্রথমত ওটা আমার লাইন নয়। দ্বিতীয়তঃ একটা জোলো একঘেয়ে গল্প যা দর্শক অনেকবার দেখে দেখে চোখ নষ্ট করে ফেলেছে। পৃথিবীর সেরা নায়ক দিয়েও সে ছবি উৎরোতে পারবে না।

—কিন্তু কাগজওলারা তোমারই বদনাম করেছিল।

—বদনাম নয়। যা সত্যি তাই বলেছিল।

—সেটা কী ?

—আমি অভিনয় করতে জানি না। এবং এটা সত্যি।

—তাই ?

—তোমারও কী তাই মনে হয় না ?

—আমার কথা থাক। তোমার কথা বল।

—কথা তো চিরদিনই আমি বলতে চেয়েছি। সময় আর মনটাই তোমার ছিল না।

—সময় বড় খেয়ালী। নিজেকে সে ক্ষণে ক্ষণে পাল্টাতে ভালবাসে।

—আমি কী স্বপ্ন দেখছি ?

—যদিও এখন ঘুমনোর সময়, স্বপ্ন দেখার সময়, তবু তুমি জেগেই আছ।

—মনসিজ কেমন আছে ?

দাঁতে দাঁত চাপে তটিনী। একটা কিছু কথা বেরিয়ে আসছিল, যা এক্ষেত্রে বেমানান। সেটা চেপে নিয়ে বলে, মনসিজের খবর তুমি জানো না ?

—স্যরি ম্যাডাম। তোমার বিয়ের রাতে আমি ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাই। আমি পারিজাত নই। হাসিমুখে নিজের অধিকার ছেড়ে তোমাকে অন্যের হাতে হাসি মুখে তুলে দেবার অভিনয় করতে পারব না। অভিনয় আমার রক্তে নেই। আমার যা কিছু সবই ওপন। র‍্যাদার ইউ ক্যান স্যে আই ওয়াজ জেলাস। অ্যাণ্ড দ্যাট ইজ টিল নাউ। তাই আমি ভারত ছেড়ে, যেখানে আর তোমার ছায়াও দেখা যাবে না সেই সব জায়গায় ঘুরে বেরিয়েছি। মনসিজের কথা জানার সময় এবং ইচ্ছে কোনটাই ছিল না। এনিওয়ে, সে এখন কেমন আছে ?

—হি ওয়াজ ডেড।

—হোয়াট ?

—র‍্যাদার আই উড স্যে হি ওয়াজ মাডারড্ বাই সামওয়ানস্ কন্সপিরেসি।

—হোয়াট দ্যা হেল ইউ সার টকিং। মার্ডার, কন্সপিরেসি। বাট হু ওয়াজ দ্যা ডেভিল ? ওয়াজ হি পারিজাত ?

—পারিজাতের ওপর তুমি বরাবরই অ্যাংরি, আমি জানি। বাট হি অলসো ওয়াজ আ ভিক্টিম অব সেম কন্সপিরেসি।

—ওহ্ মাই গড ! তার মানে পারিজাত···?

—হ্যাঁ, ঐ একই রাত্রে সেও খুন হয়।

—তুমি কী এই সব নিষ্ঠুর কথাগুলো শোনাবার জন্যে রিং ব্যাক করতে বলেছিলে ?

—কেন, তুমি কী কিছুই জানতে না ?

—কী বলছ তটিনী ? এসব জানলে আমি কী মহানন্দে বিদেশে বিদেশে ঘুরে বেড়াতে পারতাম ?

—কী করতে ?

—সত্যি কথা বলব ?

—যদি সেটা সত্যি হয়।

—অ্যাবসলিউট ট্রুথ ইজ, আমি সঙ্গে সঙ্গে এদেশে ফিরে আসতাম।

—বন্ধুকৃত্যের জন্যে ?

—বলতে পার। কারণ যারা চলে গেছে, তারা তো গেছেই। কিন্তু যে বেঁচে আছে, তাকে নতুন করে বাঁচতে সাহায্য করতাম।

—তাই ?

—সেন্ট পার্সেন্ট।

আবার তটিনীর দিক থেকে কয়েক সেকেন্ডের ভাবনা জড়িত নীরবতা।

—কী ? কিছু বলছ না ?

—ভাবছি।

—কী ?

—একদিন তোমায় আমি খুব কষ্ট দিয়েছি।

—নো ম্যাটার। জীবন তো ঠকে আর দেখে শেখে। একমাত্র তোমার মুখ ছাড়া আর আমি কিছুই মনে রাখিনি।

—সত্যিই তুমি আজো আমার কথা ভাবো ?

—তোমার অবিশ্বাসকে যেদিন বিশ্বাসে পরিবর্তন করতে পারব সেদিন তুমি নিজেই বুঝতে পারবে।

—বেশ।

—তটিনী। মাই ডিয়ার তটিনী।

—আমি বড় একা অয়স্কান্ত। আয়াম অ্যাবসলিউটলি অ্যালোন।

বলেই তটিনী ফোন নামিয়ে রেখে কর্ডলেসের সুইচ অফ করে দেয়। তার মুখে যুদ্ধ জেতার প্রথম হাসি।

* * *

কলকাতায় রোজির একটা বড় ছবির কাজ চলছে। ছবিটা মুম্বইয়ের। কিন্তু স্পট এবং আউটডোর সবই কলকাতার পটভূমিকায়। তাই আপাতত রোজি এখানেই। তার সাবেকী নিউ আলিপুরের বাড়িতেই থাকতে হচ্ছে। আজ সারাদিন প্রচুর কাজের মধ্যে থাকতে হয়েছে। স্বাভাবিক কারণেই সে ক্লান্ত। নিউ আলিপুরের বাড়ির পারলারটা নতুন কায়দা মতো করে সাজানো হয়েছে। বাড়ির ওপর তলায় থাকে রোজির বিধবা মা, কাকাকাকিমা আর তার ছেলেমেয়েরা। রোজি তার বাবামায়ের একই সন্তান। বাবার একান্ত

অনিচ্ছায় সে একদিন রঙ্গীন পৃথিবীটায় পা দিয়েছিল। তারপর অনেক ঘাটের জল খেয়ে আজ প্রতিষ্ঠিত নায়িকা। নায়িকা হ'তে গিয়ে কিছু বীভৎস মূল্য তাকে দিতে হয়েছে বটে, কিন্তু সেগুলো স্নান করার পর শুদ্ধ হয়ে যাওয়ার মতো হ'য়ে গেছে। ওগুলো আজ আর কোন রেখাপাতই করে না। জীবনে একবারই সে ভালবেসেছিল, অয়স্কান্তকে। তাকে সে বিয়েও করেছিল। ইচ্ছে ছিল অয়স্কান্তকে কোন ভাবে দাঁড় করিয়ে ঐ নোংরা রুপোলি জগত ছেড়ে ফিরে আসবে নির্ভেজাল বাঙালি বধূ হয়ে। হয়নি। সব ভেঙ্গে গেছে। এবং অয়স্কান্তকে ছাড়তে গিয়ে একজন ক্রিমিন্যালের কাজ তাকে করতে হয়েছে। মাঝে মাঝে সে ভাবে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে জলজ্যান্ত দুটো মানুষের মৃত্যুর জন্যে পরোক্ষে সে দায়ী। এর জন্যে সে কোনদিনই অয়স্কান্তকে ক্ষমা করতে পারেনি। এমন কী সে আজ মনে মনে চায় অয়স্কান্ত মরুক। ওর মরাই উচিত।

পারলারে বসেছিল ড্রিংকস্ নিয়ে। সামনের শোফায় বসে আছে চঞ্চল খুরানা। সাতাশ আঠাশের মতো বয়েস। ছেলেটা ভালো। হাসি খুশী, আমুদে। এখন প্লে ব্যাক করছে। নাম করবে, গলাটা তার দারুণ ভালো।

হঠাৎ ডোর বেলটা বেজে উঠতেই রোজি সজাগ হ'ল। একবার হাতঘড়িটা দেখল। রাত সাড়ে আট। এসময় কে আসতে পারে? না কোন প্রোডিউসার নয়। ওগুলো থাকে অন্য সময়ে। শুটিং শেষে বাড়ি ফেরার পর আর কোন প্রোডিউসার নয়।

বেশী ভাবতে হল না। বেয়ারা রামজয় সিং এসে খবর দিল, বড়বাবু আয়া হ্যায়।

বড়বাবু মানে অয়স্কান্ত। এখানকার চাকর বাকররা এখনও ওকে বড়বাবু বলেই মানে। ডিভোর্সের সাত পাঁচতো ওদের মাথায় ঢোকার কথা নয়। রোজির ঠোঁটে হাসি ফুটল। বিরক্তি নয়। কারণ লোকটাকে এখন থেকে চোখের সামনেই রাখতে হবে। নইলে ও হয়তো কোনদিন তটিনী চৌধুরীর আওতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না। অয়স্কান্ত তার শিকার। তটিনীর নয়।

—রামজয়, বাবুকে ভেতরে নিয়ে এসো। চঞ্চল, তুমি একটু পাশের ঘরে গিয়ে বসো। নতুন সুর গুলো ভালো করে ঝালিয়ে নাও। পরশু তো রেকর্ডিং। চঞ্চল হাসতে হাসতে পাশের ঘরে চলে যায়।

ঠিক পর মুহূর্তেই অয়স্কান্তর আবির্ভাব।

ডিভোর্সের পর এই প্রথম অয়স্কান্তর সামনা সামনি হল। কয়েক মুহূর্তের জন্যে রোজি একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। এটা কী তার

দুর্বলতা? লোকটা এখনও সুপুরুষ। যে কোন মেয়েকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা আজও আছে। তার ওপর এই লোকটার সঙ্গে অনেক রাত একই বিছানায় কাটিয়েছে। প্রেমের ক্ষেত্রে দেহের এক বিশাল ভূমিকা। নারীপুরুষের মেলবন্ধনের সেতু। অয়স্কান্তর দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মনে হল এ লোকটা তার ভালবাসা পাবার যোগ্যই নয়। ফিল্ম লাইনের মেয়ে হয়েও অয়স্কান্তর জন্যে সে সব কিছুই করতে পারতো। অয়স্কান্ত যদি সত্যিই তার স্বামীর ভূমিকায় সৎ থাকতো, ফিল্ম লাইন ছেড়ে দিয়ে সে তার যথার্থ ঘরনী হতে পারতো। মনে মনে এমনই একটা সুখের স্বপ্নও তার ছিল। কিন্তু এই লম্পট দুশ্চরিত্র লোকটাকে আর কিছুতেই সহ্য হচ্ছিল না। মেয়েরা ভালবাসার জন্যে সব কিছুই ত্যাগ করতে পারে। আবার সেই ভালবাসাকে যদি বিশ্বাসহীনতার হাঁড়ি কাঠে মাথা দিতে হয় তখন মেয়েরা হয়ে ওঠে অন্য কিছু, ভয়ংকর কিছু।

—কী? তাকিয়েই থাকবে? বসতেও বলবে না তোমার একদার স্বামীকে?

—তোমাকে বসতে বলা মানে বিষধর নিয়ে খেলা করা! তা আমার কাছে আবার কোন্ মতলবে?

রোজিকে তোয়াক্কা না করেই অয়স্কান্ত বেশ জাঁকিয়ে বসে সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলে, একদিন কিন্তু এই বিষধরের সঙ্গেই সহবাস করেছো।

—কারণ এই বিষধরকে সেদিন মহাদেবের অঙ্গভূষণ বলে মনে হয়েছিল। এনিওয়ে, বলে ফেলো মতলবটা কী?

—সরাসরি বলব, না ফেটিয়ে ফেটিয়ে বলব?

—ভনিতা ছাড়।

—ছাড়তেই তো এসেছি যদি তুমি এখন কিছু ছাড়।

—যেমন?

—কিছু টাকার দরকার।

—ভিক্ষে?

—না। অয়স্কান্ত ভিক্ষে করে না। দাবী বলতে পার?

—ভিখিরি দাবী করতে পারে?

—তোমার মুখের বাড়টা অনেক বেড়ে গেছে এই কদিনেই।

রোজি হাসে।

—হেসে যাও। সে স্বাধীনতা তোমার আছে। কিন্তু লাখ দুয়েক টাকা দরকার। কবে দিচ্ছ সেটা বলে যত খুশী হাসতে পার।

—আমি হাসছি তোমার স্পর্ধার দৌড় দেখে। এবং আরো হাসছি তোমার চাওয়ার হাতটা খুব শিগগীরই ভেঙে যাবে বলে।

হো হো শব্দে পারলার কাঁপিয়ে অয়স্কান্ত বলে, শানওয়ালারা আঁশ-বটিতে শান দিতে পারে কিন্তু কোপ বসানোর জন্যে বুকের যে সাহস দরকার সেটা তাদের থাকে না। তা যদি থাকতো তাহলে দেশটা ওরাই চালাতো, নেতারা নয়। তুমি তো অভিনেত্রী, নেত্রী নও।

—তুমি বোধ হয় দুর্গা প্রতিমাকে ভাল করে লক্ষ করনি। অবশ্য যে সব দেখার থেকে মদ আর মেয়ে মানুষের শরীর দেখার আগ্রহ তোমার বেশী। পারলে দেখে নিও মা দুর্গার একটা বর্শার আঘাতেই অসুরের মতো শক্তিশালী আর নিষ্ঠুর পুরুষ বধ হয়ে গিয়েছিল। সেটা উপড়ে ফেলার ক্ষমতাও অসুরের ছিলনা।

—রূপকথার গপ্পো শোনাচ্ছ?

—মেয়েদের শক্তি সম্বন্ধে তোমার কোন আইডিয়া নেই, তাই মা দুর্গার প্রসঙ্গ টানলাম। এখন শোন, তোমার দাবীর ভয়ে নয়, অনুগ্রহ করে তোমাকে সেদিন পাঁচ লাখ টাকা দিয়েছিলাম। তোমার জন্যে তিনটে মিথ্যে সর্বনাশা ফোন করেছিলাম। তুমি কী মনে করো তোমার হাত থেকে শুধু-মাত্র ডিভোর্স সাইন পাবার জন্যে? না অয়স্কান্ত, তোমার অনেক বরাত যে ডিভোর্সের ফর্মটা তোমার দিক থেকে পাইনি। তাহলে হয়তো ঐ খেসারৎ তোমায় দিতে হত। আমি তোমার মতলব বুঝতে পারিনি বলে তোমার কথামত তিনটে ফোন করেছিলাম। আর পাঁচ লক্ষ টাকা দিয়েছিলাম শুধুমাত্র তুমি যাতে ভেসে না যাও সেই জন্যে। তোমার সঙ্গে সব লেনদেন শেষ। আর একটা টাকাও তুমি আমার কাছ থেকে পাবে না।

অয়স্কান্ত আরো একবার শব্দ তুলে হেসে উঠে বলল, এতক্ষণ তোমার লেকচার শুনে মনে হচ্ছিল পাঁচ বছরের কোন শিশুকে বোধহয় প্রথম পাঠ শেখাচ্ছ। অয়স্কান্ত জীবনে কখনও হারেনি। হারতে শেখেনি। হারতে ভালবাসে না। এ রকম একটা দিন আসতে পারে, তাই তোমার টেলিফোনিক হাম্বি হুমকি জানানো ফোনের কণ্ঠস্বর আমার কাছে টেপ করা আছে।

—মানে?

—অতি সরল। আমি এই ঘরে বসে তোমায় বলেছিলাম পাশের ঘর থেকে কর্ডলেসে তুমি আমাকে ফোনে শোনাও কাকে কখন কোন ভয়েসে কী কী ডায়লগ বলবে। তোমার ভয়েস শুনে তোমাকে আইডেন্টিফাই করা যায় কিনা সেটা পরীক্ষার জন্যে। তুমি কথা বলেছিলে, শুনেছিলো আমার জাপানী ছোট্ট টেপ। টেপ বিট্রে করেনি। বুকের মধ্যে সযত্নে ধরে রেখেছে।

—ইউ ডেভিল।

—বলো, যা খুশী গাল দাও, কোন লাভ নেই। ঐ টেপটা লালবাজারে পৌঁছে যাবে, যাতে প্রমাণিত হবে, মনসিজ নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে

যেকোন কারণেই হোক, তোমার শত্রুতা ছিল। তাকে তুমি মারতে চেয়েছিলে। নিজের হাতে মারোনি। কিন্তু তোমার ষড়যন্ত্রের সেই সকালে লেকভিউ পয়েন্টে যে দুটো মানুষ খুন হয়েছিল তার পরিকল্পনা তোমার। তুমিই আসল কালপ্রিট। বাকীটা আমার ল-ইয়ার করে দেবে। তাই বলছি, স্বনামধন্যা অভিনেত্রী যদি খুনের কেসে জড়াতে না চায় তাহলে আপাতত দু লাখ। তারপর আবার ভাবা যাবে। আরে বাবা, আমি তো দীনদরিদ্রের টাকায় হাত দিচ্ছি না। তোমার অঢেল টাকা। কে খাবে এত? বরং এ অভাজন সাম্প্রতিক একটি বিশেষ প্রয়োজন মেটাতে পারবে।

শব্দহীন হাততালি দিতে দিতে অয়স্কান্তর দিকে তাকিয়ে থেকে রোজি বলে, ঈশ্বর বলে যদি কেউ থাকেন তাহলে তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেন নি।

—ভুল বললে রোজি, এখন জন্ম, মৃত্যু ঈশ্বরের এক্তিয়ারের বাইরে। ঈশ্বরের ইচ্ছায় কিছু হয় না। মানুষ পৃথিবীতে আসে বাবা মায়ের ইচ্ছেয়। আর চলে যায় ডাক্তারের অবহেলায় অথবা অক্ষমতায়।

—তাই যদি বল তাহলে বলতে হয় তোমাকে পৃথিবীতে আনার সময় তোমার বাবামায়ের মনে শয়তানের খেলা চলছিল।

হঠাৎ অয়স্কান্ত উত্তেজিত হয়ে ওঠে, ইউ ব্লাডি, সান অব আ বীচ্ আমার বাবা মা সম্বন্ধে কোন নোংরা কথা বললে,

নিমেষে ম্যাক্সির নীচে রাখা রিভলবারটা হাতে তুলে নিয়ে রোজি বলে, এটা দেখেছ আমার হাতে? একবার টানলেই, তোমাকে তোমার শয়তানের নরকে ফিরে যেতে হবে। উত্তেজিত না হয়ে চুপ করে নিজের জায়গায় বসে থাক। আর একটা কথা শোন, রোজি সেনের একটা নির্দেশে, এ বাড়ি থেকে তুমি আর কোনদিনই বেরুতে পারবেনা। কোন্ শয়তানের আড্ডায় তোমার লাশ পড়ে থাকবে সেটা পুলিশের পক্ষেও খুঁজে বার করা শক্ত হবে।

অত্যাশ্চর্য হিমশীতল কণ্ঠে অয়স্কান্ত বলে, আমি জানি রোজি। তোমার সিকিউরিটির বহর আমার অজানা নয়। ওয়েল, আজ আমি যাচ্ছি। তবে অয়স্কান্ত রায় জীবনে হারেনি। হারতে শেখেনি, হারতে ভালবাসেনা। এবার আসবো। প্রস্তুত হয়েই। বরং চিন্তাভাবনা করতে থাক, কে কার পরিণতি কোথায় নিয়ে গিয়ে দাঁড় করায়।

অয়স্কান্ত চলে যাচ্ছিল। প্রশ্ন তুলে রোজি ওকে থামায়। ইতিমধ্যে মনে মনে কিছু একটা ভাবনাও ভেবে নিয়েছে। সে বলে, টেপটা কোথায়?

—টেপের জায়গায়। অবশ্য সেটা তুমি খুঁজে পাবে না।

—ঐ গুলো আমার চাই।

—এই তো, পথে এসো। টেপ ফেরত পেতে চাইলে টাকার অঙ্কটা যে আরও বেড়ে যাবে।

—না। অঙ্ক একটাই থাকবে। কারণ ডুপ্লিকেট টেপটা যে তুমি করিয়ে নিতে পার সেটা আমি জানি।

—তাহলে আর আমার খরচ বাড়িয়ে কী লাভ? জানোই তো আবার আসবো।

—জানি। তবু টেপটা ফেরৎ চাই।

—টাকা কত দেবে?

—বললাম তো ঐ একই।

—একটু বাড়াও।

—না।

—তুমি মাইরি বড় মাক্কিচুষ হয়ে যাচ্ছ! ওয়েল। আমি ফোন করেই আসব।

অয়স্কান্ত আর দাঁড়ায় না। ও চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে কোচের সঙ্গে লাগানো কলিং বেলের নব টেপে। কালো শার্ট আর কালো প্যাণ্ট পরা একটি আপাত দুধর্ষ লোক এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়ায়।

—যে লোকটা এই মাত্র বেড়িয়ে গেল লোকটাকে আর বেশীদিন বাঁচতে দেওয়া যায় না।

—আজই নামিয়ে দোব ম্যাডাম?

—না। ও নিশ্চয়ই এমন কোন প্রমাণ তৈরী করে এসেছে যাতে ওর অপঘাত মৃত্যু রোজি সেনকে সন্দেহের জালে আটকে দেবে। সর্বদা ওকে নজরে রাখবে। কোথায় যায়, কী করে সময় কাটায়। তারপর আমিই বলে দোব কবে আর কোথায়।

লোকটা চলে যায়। চঞ্চল খুরানা ঘরে এসে ঢোকে।

—দিদি, আমি সব শুনলাম।

—ঠিক করনি কাজটা।

—কিন্তু পাশের ঘর থেকে সব শোনা যাচ্ছিল। ভাবতেও অবাক লাগে ইনি একদিন আপনার হ্যাজব্যাণ্ড ছিলেন।

—কিন্তু তুমি কিছুই শোননি। এটাই তোমার দিদির অনুরোধ।

—অনুরোধ না করলেও, শুনতাম। কারণ এই সব বাজে কেলেঙ্কারীতে আমি জড়াতে চাই না। তাহলে আমার কেরিয়ার গন। আমি আজ চলি দিদি।

—হ্যাঁ এসো।

চঞ্চল চলে যাবার পর অদ্ভুত জিঘাংসায় রোজির চোখ দুটো কেবল জ্বলে উঠল। তারপরই ঢক ঢক করে গ্লাসের অবশিষ্ট হুইস্কি গলায় ঢালান করে দিল।

* * *

—ভুল, আমি ভীষণ ভুল করেছি অয়স্কান্ত। লেখাপড়ায় ব্রিলিয়াণ্ট

মনসিজকে দেখে, ওর শান্তচরিত্র, বালকসুলভ নম্রতা সেদিনের তটিনার চোখে প্রেমের কাজল পরিয়ে দিয়েছিল। তাই পারিজাতের মতো বন্ধুকে অবহেলা করেছি। অবহেলা করেছি তোমাকে। মনসিজ কেবল লেখাপড়াই শিখেছে, কিন্তু ও জানতো না একজন স্টুডিয়াসের থেকে প্র্যাকটিক্যাল কোন উচ্ছল যুবককেই মেয়েরা বেশী পছন্দ করে।

ম্যাড হাউসের এক কোনে স্বপ্নালোকিত ছায়ায় বসে ছিল অয়স্কান্ত আর তটিনী। মুখোমুখি। দুজনের হাতেই মদের গ্লাস।

—মনসিজ আর পারিজাতের জন্যে কী আজও তুমি দুঃখিত ?

- মনসিজ নয়, পারিজাতের জন্যে একটা দুঃখ আমায় সিক্ করে দেয় মাঝে মাঝে। ও ছিল আমার সত্যিকারের বন্ধু। আমার কারনেই তাকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। বাট মনসিজ, হি ওয়াজ আ কাওয়ার্ড, কেরিয়ারিস্ট অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম জেলাস। এমন কী ও আমাকে একটা সন্তান পর্যন্ত দিতে পারেনি। ভাবতে পার, ও আমাকে আর পারিজাতকে নিয়ে নোংরা সন্দেহ করা শুরু করেছিল। এর নাম ভালবাসা ? যেখানে কোন বিশ্বাস অবশিষ্ট নেই। সত্যি বলতে কী ?

—কী ?

—র‍্যাদার আই হেট হিম। আর তুমিও সেই রকম। কায়দা করে সেই লটারির কাগজটা পাল্টাতে পেরেছিলে, কিন্তু নিজের অধিকার কেড়ে নিতে পারনি।

—কিন্তু তটিনী, আমি সময়ে বিশ্বাসী। একদিন বলেছিলাম অয়স্কান্ত জীবনে কোনদিন হারেনি, হারতে শেখেনি ! হারতে ভালবাসেনা।

—কিন্তু তুমি তো হেরেই গেছ।

—ঐ যে বললাম, আমি সময়ে বিশ্বাসী। যা আজকের হার, ভবিষ্যত জিতের ক্ষেত্রভূমি সেখান থেকেই তৈরী হয়। তা নইলে কী দশবছর পর তুমি খুঁজে খুঁজে আমার ফোন নাম্বার জোগাড় করে আমায় ফোন করতে পার ?

—তোমার খুব অবাক লেগেছিল, তাই না ? আমার ফোন পেয়ে ?

—না। কারণ আমার বিশ্বাস ছিল জীবনের শেষ দিনেও তোমার কাছ থেকে একটা ফোন পাবই। এবং পেয়েছি।

—এই বিশ্বাসটা আগে ভাগে হলে দশটা বছর নিস্ফলা কেটে যেতো না।

—তাতে কী হল তটিনী, এই পৃথিবীতে তুমিও আছ, আমিও আছি। কালের পরিপ্রেক্ষিতে দশটা বছর কিছুই নয়। আর কেউ তো আমাদের মিলনে বাদ সাধতে আসবে না।

—তুমি এতদূর ভেবে নিয়েছ ?

—আমি অপটিমিস্ট্। বরাবরই। তুমি কী আমায় প্রথম দেখছ ?

—সত্যি বলছি অয়স্কান্ত, এই একা জীবন আর আমি টানতে পারছি না। সারাদিন ডাক্তারী করি। তারপর সন্ধ্যে থেকে সেই দুপুর রাত পর্যন্ত মদ খেতে খেতে যখন শরীরটা একেবারে অবশ আর শিথিল হয়ে যায়, কোন রকমে বিছানার কোলে গিয়ে আশ্রয় নিই। তাতেই কী রেহাই আছে ? নানান দুঃস্বপ্নে, আরো গভীর রাতে ঘুম ভেঙ্গে গেলে, ছতলার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। নিদ্রাতুর কলকাতার নির্জনতার সামনে গিয়ে দাঁড়াই। অপেক্ষা করে থাকি ভোরের প্রথম সূর্যের।

—ডাক্তার না হোয়ে তোমার কবি হওয়াই উচিত ছিল।

—উচিৎ তো অনেক কিছুই ছিল। কিন্তু সব যে এলোমেলো হয়ে গেল। তটিনীর ছড়ানো হাতের ওপর অয়স্কান্ত গভীর আবেগে নিজের হাত চেপে ধরে বলে, এখনও তো সময় আছে তটিনী।

—কিসের ?

—ভুল শুধরে নেবার। আমাদের এমন কিছু বয়েস নয়। আবার এখান থেকেই শুরু করতে পারি।

—আশ্বাস দিচ্ছ ?

—বিশ্বাসের কথা বলছি।

হঠাৎ হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তটিনী বলে, তোমার যেন কোথায় যাবার ছিল ?

—হ্যাঁ। একজনের কাছে লাখ দুয়েক টাকা পাই। সেটা নেবার ব্যাপার ছিল।

—বিজনেশ ?

—চাকরি তো আমি করতে শিখিনি। আমাদের রক্তে যে চাকরি নেই তটিনী।

—হ্যাঁ, তুমি তো আবার এক হিস্টোরিক্যাল বংশের বংশতিলক। তবে চল ওঠা থাক।

অয়স্কান্তও একবার হাত ঘড়ি দেখে নেয়। নটায় রোজির বাড়ি যাবার কথা। কোর্টের ইনসাইড পকেটে হাত ছুঁইয়ে টের পেলো টেপটা জায়গাতেই আছে।

—হ্যাঁ চল।

—আজ কিন্তু সব খরচ আমার, বলেই তটিনী হ্যান্ডব্যাগ থেকে একটা পাঁচশো টাকার নোট গ্লাসের নীচে গুঁজে দিয়ে উঠে পড়ল।

—তাহলে আমাদের আবার করে দেখা হবে ?

—অয়স্কান্ত, সমাজে আমার একটা নোবেল প্রফেশান আছে। অনেকেই ডাক্তার তটিনী চৌধুরীকে চেনে। আমার পক্ষে রোজ রোজ রেস্তরাঁয় আসা তো মানান সই দৃশ্য নয়।

—তাহলে তুমি কী করতে বল ?

—এবার থেকে তুমিই নয় আমার বাড়ি চলে এসো। কেউ থাকে না। একজন চাকর আর একজন মেড সারভেণ্ট। তারা কেউ মনিবের ব্যাপারে নাক গলাবে না।

—ভেরীগুড প্রোপজাল। এবার থেকে সেই ভাল।

ওরা বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে পিছনের চেয়ার থেকে কালো শার্টপ্যাণ্ট পরা একটি ছেলে মোবাইলে রোজি সেনকে জানালো, ম্যাডাম ওরা দুজনে এই মাত্র বেরিয়ে গেল। এরপর থেকে ওরা হোটেলে আসবে না।

—যাচ্ছে কোথায় ?

—লেডি ডাক্তার নিয়ে যাচ্ছে নিজের বাড়ি। কিন্তু ভদ্রলোক সম্ভবত আপনার কাছে যাচ্ছে। টেপ সমেত।

—ওয়েল, লেট হিম কাম। ইউ ফলো দেম।

* * *

সাদার্ন অ্যাভিনুর ওপর দিয়ে তটিনীর মারুতি এগিয়ে যাচ্ছিল বেশ দ্রুত বেগেই। মগজে কিঞ্চিৎ পরিমাণে সুরাবেশ থাকলেও তটিনীর গাড়ি চালানোর হাতটা বেশ ভালোই। আজ রাস্তার জ্যামটাও কম। গাড়ি চালাতে চালাতে তটিনী একবার পাশের সীটে বসা অয়স্কান্তকে আড়চোখে দেখে নেয়। একটু টিপ্সি ভাব। গুন গুন করে কিছু একটা গানের কলি ভাঁজার চেষ্টা করছে।

—পুলক ?

—হোতেই পারে।

—কারণটা কী আমি ?

—বোকা বোকা কথা বোল না। জানো তটিনী, সারাজীবন ধবে আমি একটি মেয়েকেই চেয়েছি। সে তুমি।

—এটা কিন্তু খোসামুদি কথা হয়ে গেল। আমাকে সামনে পেয়ে।

—না, একেবারেই নয়। এর থেকে নির্ভেজাল সত্য আর কিছু নেই।

—তাহলে বলছ দশ বছর তুমি আমার প্রতীক্ষাতেই আছ। আর কোন মেয়ে আসেনি তোমার জীবনে ?

অয়স্কান্ত বোধহয় একটু ঢোঁক গিলল। তারপর নতুন কোন ভাবনাচিন্তার আগেই বলে দিল, তুমি কেমন করে ভাবলে তটিনী আমি আর কোন মেয়েকে ভালবাসতে পারব ?

—ভাবাভাবির কথা নয়। আসলে এমনটাতো হয় না। আচ্ছা অয়স্কান্ত, একটা সত্যি কথার জবাব দেবে আমায় ?

—তোমার কাছে কোনদিনতো কোন মিথ্যে কথা বলিনি। তবে তোমার জন্যে একবার আমায় জোচ্চুরির আশ্রয় নিতে হয়েছিল। দ্যাট ওয়াজ দ্য লটারি গেম।

—তুমি এই দশ বছরে একবারের জন্যেও ভারতবর্ষে ফেরোনি ?

—তোমাকে বলা হয়নি, একবার এসেছিলাম। বম্বে। বর্তমানের মুম্বাই। টোকিওতে আলাপ হয়েছিল এক প্রোডিউসারের সঙ্গে। আমার চেহারা টেহারা দেখে ভদ্রলোক ওর ছবিতে আমাকে অভিনয় করতে বলেন। নতুন এক ধরণের অভিজ্ঞতা হবে ভেবে আমি রাজী হয়ে যাই।

—ও হ্যাঁ। তুমিতো এর মধ্যে সিনেমার হিরো পর্যন্ত হ'য়ে গেছ।

—ঐ প্রথম ঐ শেষ।

—ভুল করেছিলে। যে লাইনে যাবার জন্যে লক্ষ লক্ষ ছেলে পাগল, সে লাইনে সুযোগ পেয়েও তুমি ছেড়ে দিলে ? কত নাম, কত টাকা।

—একটাই কারণে ছেড়ে দিলাম।

—কী ?

—দ্যাট ভলাপ্চুয়াস লেডি, রোজি সেন। হিরোইন।

—সে আবার কী করল ?

—আগুন আর ঘি পাশাপাশি থাকলে যা হয়। ও আমার প্রেমে পড়ে গেল। ওকে আমি অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম যে আমার জীবনে একটি নারীই এসেছিল, যাকে আমি সারাজীবন ধরেই ভালবাসব। অন্য কোন নারীতে আমার রুচি নেই। শুনতো না। একদিন তো ফুলড্রাঙ্ক হ'য়ে আমার ফ্ল্যাটে এসে, যাক সেকথা। আমি, ওনলি টু অ্যাভয়েড দ্যাট আন-ইয়েলডিং গার্ল, আমি মুম্বাই ছেড়ে জাপান ফিরে যাই।

গাড়ি চালাতে চালাতে তটিনীর মুখটা বিরক্তিতে ভরে ওঠে। কিন্তু সে ভাব প্রকাশ না করেও বলে, বিশ্বাস করতেও ইচ্ছে করে না যে আমার জন্যে তুমি এত বড় একটা প্রস্পারাস লাইন ছেড়ে দিলে। অর্থ যশ প্রতিপত্তি। কী না পেতে ?

—তোমার জন্যে আমি জীবনের আরো অনেক মূল্যবান কিছুই ত্যাগ করতে পারি।

তটিনী নীরবে কিছুক্ষণ গাড়ি চালায়। গাড়ি তখন গড়িয়ামুখী।

—তুমি যেন কোথায় নামবে ?

—প্রিন্স আনোয়ার শাহ্ রোডের মুখে ছেড়ে দিলেই হবে।

—ওখানে গেলে আজ রাত্রে তুমি দু লক্ষ টাকা পাবে ?

—ইয়েস ডার্লিং।

—তোমার নিজের টাকা ?

—অফকোর্স।

—আমি যদি বলি আজ রাতে আমার ওখানে যেতে। দুলাখ টাকার চেয়েও কী আমার দাম কম?

—হোয়াট ডু ইউ মীন?

—কিছুই না। এখন তো সবে রাত নটা। নাইট ইজ টু ইয়াং। আমার বাড়ি যাবে। একসঙ্গে বেশ গভীর রাত পর্যন্ত ড্রিংক করবে। কথা বলবে তুমি। অনেক কথা। দশবছর আগের আর দশবছর ধরে তোমার জমে থাকা সব কথা। আর আমি শুনব। সব, সব হতাশা আর অভিমানের কথা।

—কিন্তু?

—আমি যে বড় একা অয়স্কান্ত! মনসিজ বেঁচে ছিল নিজের জগতে নিজের স্টাডিতে। খুব একটা বেশী কথা বলা হত না। কথা বলতে গেলে সে বিরক্ত হ'ত। পাহাড় আর জঙ্গলই ছিল আমার কথা বলার সঙ্গী। লোকে আমায় পাগল বলত। মাঝে মাঝে পারিজাত আসতো। তা সে আর কতটুকু। তারপর ওরা দুজনেই চলে গেল। আমারও সবকথা শেষ। শুরু হল একক নিঃসঙ্গতা। অ্যাবসলিউট সলিটারি। যাবে না? অ্যাটলীস্ট একটা রাত।

—তটিনী বড় লোভ দেখাচ্ছ তুমি? স্বপ্নের জালটা নাচাচ্ছ আমার চোখের সামনে। তোমার প্রোপজালটা অ্যাক্সেপ্ট করতে পারলে খুবই ভালো লাগতো। নিজেকে ভাগ্যবান মনে হ'ত। তবে কী জান মাঝে মাঝে কিছু সামান্য জিনিষও আরো বেশী দামী জিনিষের থেকেও মূল্যবান হয়ে ওঠে। তারমানে এই নয় দামী জিনিষটাকে উপেক্ষা করা হল। আসলে এই টাকাটা আজ রাতেই পাওয়ার ওপর অনেক কিছু ডিপেণ্ড করছে ডার্লিং।

—কী রকম?

—কাল সকালে দেড়লক্ষ টাকা আমাকে পেমেণ্ট করতে হবে। আর একটা মেশিনের জন্যে পঞ্চাশ হাজার অ্যাডভান্স। আমি যে কথা দিয়েছি। নইলে লোকগুলোর কাছে মুখ দেখাতে পারব না। তাছাড়া?

—তাছাড়া?

—অয়স্কান্ত রায় কারো কাছে কথার খেলাপ করতে শেখেনি। করেওনি কোনদিন।

—ইজ ইট?

—বিলীভ মী।

—বাট, কী যেন চিন্তা করে নেয় তটিনী, তারপর বলে, ঐ দু লক্ষ টাকা যদি আজ রাতে আমি তোমাকে দিয়ে দিই?

—কী বলছ ডার্লিং?

—অয়স্কান্ত, একদিন তুমি বলতে, যা তুমি জীবনে চেয়েছ তা তুমি পেয়েছ

অথবা যতক্ষণ না পাচ্ছ ততক্ষণ তোমার শান্তি নেই। কিন্তু তুমি জানো এই মুহূর্তে আমি তোমাকে চাই, মনে প্রাণে। এবং সেটা পাওয়ার জন্যে যে কোন মূল্য দিতে রাজী। দু লক্ষ টাকা তার কাছে কিছুই নয়।

অয়স্কান্তর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে থাকে। ভালো করে মুখটা মুছতে মুছতে ভাবতে থাকে আজ ভোরে সে কার মুখ দেখে উঠেছিল। রোজি নিজেকে বাঁচাবার জন্যে তাকে দু লক্ষ টাকা দেবে। আজ না গেলেও কাল দেবে। কিন্তু তটিনীর দু লক্ষ টাকাটাতো পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা। কোথায় ছিল সে আর কোথায় তটিনী। কয়েকবছর আগে এই তটিনীকেই সে শেষ করে দিতে চেয়েছিল। ভাগ্যিস সেদিন তটিনী প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল। নইলে, এই অপূর্ব সন্ধ্যাটা তার জীবনে কোনদিনও আসতো না। সেই তটিনী আজ তাকে দু লক্ষ টাকা ধার দিতে চাইছে। কী, না এক রাত্রি সে তার সঙ্গ চায়। রাজত্ব রাজকন্যা একসঙ্গে? অয়স্কান্তর একবার মনে হলো কোন এক জ্যোতিষিকে দিয়ে তার ভাগ্যটা পরীক্ষা করলে হোত। বৃহস্পতি তুঙ্গে? টাকার জন্যে যখন তার খুব হা পিত্যেশ দশা তখন কয়েক ঘণ্টার তফাতে চার লক্ষ টাকা। আর তটিনীর কাছে ধার মানে ও আর কোনোদিনও ফেরৎ দেবার প্রশ্ন নেই। কারণ তটিনী এখন তার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। মেয়েদের ব্যাপারটা সে প্রায়ই লক্ষ করেছে। প্রেমের জন্যে ওদের কাছে টাকার মূল্যহঠাৎই কমে যায়। ছেলেরা যেখানে চোদ্দবার চিন্তা করে মেয়েরা সেখানে দরাজ।

—কী ভাবছ? ভাবছ ভুলিয়ে ভালিয়ে বাড়ি নিয়ে যদি আর টাকা না দিই?

—তোমার বোধহয় নেশা হয়েছে। এসব কথা ভাবব কোন অকৃতজ্ঞতায়? আমি কী জানিনা তোমার মুখের কথাই যথেষ্ট। কিন্তু এতগুলো টাকা!

—এমনি দিচ্ছি না। ধার। টাকা পেলেই তুমি তো আবার ফেরৎ দিয়ে দেবে।

—আর যদি টাকা পেতে পেতে দেরী হয়, অথবা পেয়েও না ফেরৎ দিই!

—ডাক্তার মিসেস তটিনী চৌধুরী দু লক্ষ টাকার জন্যে কেঁদে ভাসিয়ে দেবে না। তুমি জানো আমার মাসিক আয় কত? যা আমি কোন মাসেই পুরোটা শেষ করতে পারি না।

—দ্যাট মিনস্ ইউ আর আর রীচ লেডি। হবে না কেন কলকাতার বিখ্যাত লেডি অনকোলজিস্ট।

—বলতে পার। এবার আর ভাবার কিছু রইল না। নাউ, টু ওয়ার্ডস্ মাই রেসিডেন্স।

যাদবপুর থানা ক্রশ করে গাড়ি এগিয়ে চলল গড়িয়ার দিকে। পেছনের গাড়িটা এতোক্ষণ সমানে ফলো করে যাচ্ছিল তটিনীর মারুতিকে। প্রিন্স আনোয়ারে না ঢুকতেই কালো শার্ট প্যান্ট পরা যুবকটি সঙ্গে সঙ্গে সেলের নব টিপতে শুরু করে।

—হ্যালো, ম্যাডাম সেন ?

—হ্যাঁ বলো কী খবর ?

—ওদের গাড়ি আনোয়ার শাহে ঢুকলো না। সোজা যাদবপুরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

—লেডি ডাক্তারের সঙ্গে ?

—হ্যাঁ গাড়ি তো ওনারই।

—ঠিক আছে। ফলো দেম। মনে হচ্ছে ডাক্তার চৌধুরীর বাড়িই ওদের আজ রাতের ঠিকানা। তোমার যন্ত্র লোড করা আছে ?

—ও বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

—আমি দুটো জিনিষ আজ রাতের মধ্যে চাই। নাম্বার ওয়ান, দ্যাট ক্যাসেট অ্যাণ্ড নেক্সট্ ওয়ান,

—বলতে হবে না ম্যাডাম। বুঝে নিয়েছি।

—সকাল ছটার মধ্যে তোমাকে একস্পেক্ট্ করছি। গুড নাইট।

* * *

রাত তখন সাড়ে বারেটা। দুজনেই হাই। অয়স্কান্তের সুন্দর মুখে উজ্জ্বল রক্তিমাভা। মাঝে মাঝে সে কেবল দু চোখ দিকে তটিনীর সারা দেহ লেহন করে চলেছে। তটিনীর অঙ্গে প্রায় স্বচ্ছ নাইটি। উজ্জ্বল আলোর নীচে মাঝে মাঝে তা বড়ো প্রকট হয়ে উঠছে। অয়স্কান্তর আদিম লিপ্সা আরো বেশী পশুত্বের দিকে এগিয়ে যাবার প্রবণতায় ছটফট করছে।

অয়স্কান্তকে যত দেখছে তটিনী ভেতরে ভেতরে ততবেশী হিংস্র হয়ে উঠছে। হ্যাঁ, তটিনী এই দিনটার অপেক্ষায় ছিল। অনেক, অনেকদিনের অপেক্ষা। অয়স্কান্তর মতো নিষ্ঠুর লম্পট, চায় টাকা, মদ আর নারী দেহ। বাড়ি ফিরেই দু লক্ষ টাকার চারটে বাণ্ডিল ওর সামনে রেখে দিয়েছে। লোকটা তাতেই খুশ। টাকার বাণ্ডিলগুলো তখনো হাত দিয়েও দেখেনি। তারই মধ্যে এসে গেছে দু দুটো বিদেশী হুইস্কি। ওকে এক পেগ দিয়ে তটিনী বাথরুমে চলে যায়। খুব ভালো করে স্নান করে। তারপর দেহ রোমাঞ্চিত করতে নিজের সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে দেয় বিদেশী পারফিউম। একটা স্বচ্ছ নাইটি পড়ে যখন ও পারলারে এসে বসে তখন অয়স্কান্ত মোহগ্রস্ত, ভূত দেখা ভয় ভয় অবাক চোখ।

নেশা যখন প্রায় তুঙ্গে, অয়স্কান্তর গায়ে গা ঠেকিয়ে তটিনী তার মোহ ছড়াতে ছড়াতে বলে, অয়স্কান্ত, তুমি কেন বলেছিলে তুমি আমার কোনদিনও মিথ্যে বলনি।

স্বর জড়িয়ে আসছিল অয়স্কান্তর। টেনে টেনে বলে, এমন কোন মানুষ তুমি দেখাতে পারবে তটিনী, যে জীবনে একটাও মিথ্যে কথা বলেনি।

শেষ পেগটা অয়স্কান্তর হাতে তুলে দিয়ে নিজেও সিপ্ করতে করতে তটিনী বলে, তার মানে তুমি আমার কাছে মিথ্যে বলেছ ?

—আলবাৎ বলেছি। কিন্তু সেগুলো ধরার মতো মগজ তোমার নেই।

তটিনী খিলখিল শব্দে হেসে ওঠে।

—হাসছ কেন ?

—তুমি সত্যিই নির্বোধ। বুদ্ধির খেলায় তুমি আমাকে হারাতে পারনি অয়স্কান্ত।

জড়ানো গলায় অয়স্কান্ত বলে, বুদ্ধির খেলা ? এ সব কথায় মানে কী তটিনী ?

—তোমার সারাটা জীবন যে মিথ্যের বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে আছে সেটা আমি জানি।

—জান ? কী জান ?

—ভারতবর্ষ ছেড়ে যাবার আগে তুমি প্ল্যান করেছিলে কী করে এক ঢিলে তিনটে পাখি মারবে। অথচ তোমার গায়ে আঁচড়টি লাগবে না।

—এটা তোমার ব্যক্তিগত ভাবনা।

—না, এটা আমার ডিডাকশান। বিলেতে গিয়ে তুমি পড়াশুনো কিছুই করনি। বাপের টাকায় স্ফূর্তি করেছ। তারপর একসময় নিশ্চই কোন বিতারণের চাপে তুমি জাপান চলে এসেছিলে। অ্যাম আই রং ?

আবার একটা চুমুক দিয়ে মাথা খাড়া করার চেষ্টা করেও মাথা ঝুলিয়ে দিতে বাধ্য অয়স্কান্ত বলে, গল্প বলছ ? ও হ্যাঁ গল্প করার জন্যেই তো আমরা আজ মিট করেছি, বল, শুনছি।

—আমি সব জানি অয়স্কান্ত। রোজি সেনের প্রেমে পড়ে তুমি তাকে বিয়ে করেছিলে। তারপর রোজির দৌলতে একটা ছবিতে সুযোগ পেয়েও অপদার্থ এবং নবিস হওয়ার জন্যে টোটালি ছবিটাকে ফ্লপ করিয়ে তুমি লাইন ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল।

—বেশ, বেশ। আর কী জান বলো ?

—সব, সব জানি। জানি কেমন নিখুঁত পরিকল্পনায় রোজির দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নকল গলায় মনসিজকে ট্র্যাপ করেছিলে। পরিজাত আর আমাকে সেই একই ফাঁদে জড়িয়ে একই স্পটে নিয়ে গিয়েছিলে। নিজে একটাও খুন না করে কত সহজে দুজনকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছিলে।

—বাহ্, গুড, ভেরী গুড ইমাজিনেশান। বলে যাও।

—চেয়েছিলে আমাকেও সরিয়ে দিতে। শেষ পর্যন্ত সেটা আর হয়ে ওঠেনি বোধহয় আজকের এই রাতটার জন্যে।

—আজকের রাত মানে ?

—এ এমনি এক রাত যে রাতে সব গোপন কথা উগড়ে ফেলতে হয়।

কোন রকমে জড়ানো গলায় অয়স্কান্ত বলে, সব বাজে, সব তোমার বানানো। তোমার স্বপ্ন দেখা ভূত তোমাকে তাড়া করেছে। এবার বুঝতে পারছি তুমি তোমার মোহিনী রূপের ফাঁদে ফেলে আমাকে দিয়ে সেই সকালের হত্যাকাণ্ডের একটা জবরদস্ত গ্রাউণ্ড তৈরী করে আমাকে ঝোলাতে চাইছ।

—না অয়স্কান্ত, তোমাকে আমি কোনদিন উচ্চপর্যায়ের মানুষ হিসেবে ভাবিনি। তুমি যে পূর্বপুরুষের নাম তুলে নিজেব বংশ কৌলিন্যের দোহাই পাড় ইতিহাসে তিনি বিশ্বাসঘাতক। বুঝলে অয়স্কান্ত বড়াই করার মতো তোমার কিছু নেই। ব্যক্তি জীবনে তুমি শঠ, প্রবঞ্চক. মিথ্যেবাদী, মদ্যপ এবং নারী লোলুপ এক লম্পট আর লোভী। অস্বীকার করতে পার নাকি?

অয়স্কান্তর মাথাটা ক্রমশ ঝুলে আসছিল। তার মনে হচ্ছিল বিশ্বমণি একটা পাথর কেউ তার ঘাড়ে বেঁধে দিয়েছে। জীবনে সে প্রচুর মদ্যপান করেছে। কিন্তু এমনিতো কখনও হয়নি। বরং তার একটা বিশেষণ ছিল। মদের পিপে। যে নিজের শরীরের অভ্যন্তরে মদ ধরে রাখে কিন্তু কোনদিনও মাতাল হয় না।

কিন্তু আজ একী প্রতিক্রিয়া? সমস্ত শরীর পাক দিয়ে চলেছে। পাকস্থলী থেকে কেন বিষাক্ত কোন লাভাস্রোত সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে যাচ্ছে। বুকে মধ্যে এতো জ্বালা কেন? গলার কাছে মনে হচ্ছে ভিসুভিযাস আটকে আছে। কথা বলতেও কষ্ট হচ্ছে। আশ্চর্য সব বক্তিম জ্বলন্ত অনুভূতি। শরীরটা তোলার চেষ্টা করেও পারে না। তবে কী এই তার অন্তিম মুহূর্ত? শেষ রাত? একটু আগে তটিনী যেন সেইরকম একটা কিছু বলছিল।

—ওঠার চেষ্টা কোরনা অয়স্কান্ত। বোধহয় এ জীবনে তুমি আর কোনদিনও উঠে দাঁড়াতে পারবে না।

লাল লাল চোখে তটিনীর দিকে তাকিয়ে বলে, ইউ উইচ্ ইউ বাস্টার্ড, কী মিশিয়েছ আমার গ্লাসে?

—বড্ড ভজকট নাম, বললেও মনে রাখতে পারবে না। এ কিন্তু চট্ করে মারে না। বিবেককে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে গোপন পাপের কথাগুলো আস্তে আস্তে বার করে আনে, তারপর,

—কিন্তু রাক্ষসী, তুইও কী পালিয়ে বাঁচতে পারবি? যাবার আগে আমি তোকেও নিয়ে যাব। কারণ তোর জন্যেই আজ আমি এখানে। তোর দেওয়া বিষে মরতে বসেছি। তবু আমি জিততে চাই, হারতে ভালবাসিনা। আয়, কাছে আয়, তোর গলাটা এগিয়ে দে। ঐ সর্বনাশা রূপের আগুন আমি চিরদিনের মতো নিভিয়ে দিয়ে যেতে চাই।

অনেকটা প্রলাপের মতো শোনাচ্ছিল। পরক্ষণেই ও শুনতে পেলো

ডাইনীর মতো হেসে চলেছে তটিনী। এ হাসি যেন কোনদিনও থামবে না। ভয়ঙ্কর ঐ হাসিটা তাকে চারপাশ থেকে ছেঁকে ধরছে। জড়িয়ে আসা চোখ দুটোর সামনে একটা হিংস্র কালনাগিনীর ছায়া ক্রমশ দুলে চলেছে। তবু কোন রকমে শেষবারের মতো ওঠার চেষ্টা করতে করতে অয়স্কান্ত কেবলমাত্র বলতে পারল, এ তুমি কী করলে তটিনী?

অবশ চেতনার মাঝে অন্তিম কটি কথা তার কানে গেল মাত্র, সাপিনীর হিস্ হিস্ শব্দের মতো, পরাজিত আক্ষেপে আধো চেতনায় শুনল, তটিনী বলছে, জিততে চেয়েছিলে অয়স্কান্ত, জিততে তোমায় আমি দিইনি।

ধীরে ধীরে অয়স্কান্তর মাথাটা এলিয়ে পড়ল দামী কার্পেটের ওপর।

তটিনীর হাতেও বিষপাত্র। শেষ চুমুকের পর স্খলিত চরণে সে কোন মতে গিয়ে পৌঁছতে পারে মনসিজের বিশাল ছবিটার সামনে। আসন্ন দু-চোখে মৃত্যুর কালো ছায়া নিয়ে ফ্রেমবদ্ধ দুটি উজ্বল চোখে চোখ রেখে কিছু একটা বিড় বিড় করে বলেছিল। কিন্তু সে শব্দ কারো কানে পৌঁছবার আগেই তটিনীর প্রাণহীন দেহটা সেখানেই ছিটকে পড়ে। মাত্র তিন মিনিটের এদিক ওদিকের ব্যবধানে সেই ঘরে এসে উপস্থিত হয় সেই কালোপ্যাণ্ট কালোশার্টের যুবকটি। বিস্মিত চোখ দেখে দুটি দেহ ধু ধারে পড়ে আছে। অয়স্কান্ত আর তটিনী। আর এদিক ওদিক ছিটকে আছে কয়েকটি মদের গ্লাস আর বোতল। আর আছে পাঁচশো টাকার চারটে বাণ্ডিল। যুবকটি অয়স্কান্তর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু বুঝতে পারলনা সে মৃত অথবা বেহুঁশ।

যুবকটি চটপট চারটে বাণ্ডিল জামার নীচে চালান করে মোবাইলে ডায়াল করে।

—কী খবর তুফান?

—বুঝতে পারছি না ম্যাডাম। তবে দুজনেই কাত্।

—অয়স্কান্তর পকেটে একটা টেপ আছে। ওটা বার করে নাও।

ছেলেটি আপাদমস্তক সার্চ করেও মানিব্যাগ ছাড়া আর কিছু না পেয়ে ম্যাডামকে সেই কথাই জানায়।

—ওয়েল তোমার পিস্তলটায় নিশ্চই সাইলেন্সার লাগানো আছে?

—ইয়েস ম্যাডাম।

—লোকটাকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। বুঝতে পেরেছ তোমায় কী করতে হবে?

—ইয়েস ম্যাডাম।

—কাজ শেষ করে যতরাতই হোক আমার সঙ্গে দেখা করে তোমার পেমেন্ট নিয়ে কলকাতা ছেড়ে চলে যাবে। মনে রাখবে তোমার সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না।

—ওকে ম্যাডাম।

*　　　*　　　*

রাত সাড়ে তিনটের সময় তুফান নামের যুবকটি দেখা করে রোজির সঙ্গে।

—ওখান থেকে কত টাকা পেয়েছে তুফান?

—টাকা, মানে, তুফান তোতলাতে থাকে।

—ওয়েল, ও টাকায় আমার কোন প্রয়োজন নেই। সামনের ড্রয়ারটা খোল। তোমার পঞ্চাশ হাজার পেয়ে যাবে।

তুফান ড্রয়ার খুলে আর একটা পাঁচশো টাকার বাণ্ডিল পায়। একবারে নতুন এবং চকচকে।

—তাহলে তোমার সঙ্গে দেনা পাওনা শেষ।

—আর কোনদিনও ডাকবেন না?

—নাহ্, তার আর প্রয়োজন হবে না।

তুফান সেলাম জানিয়ে বেরিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে নিকটবর্তী থানায় একটি ফোন আসে। এক মহিলা কণ্ঠের অনুযোগ, এই মাত্র কালো প্যান্ট কালো শার্ট মুখে মাস্ক পরা একটি ডাকাত আমার আড়াই লক্ষ টাকা ডাকাতি করে পালাচ্ছে। এ্যাট দ্য পয়েন্ট অব গান। প্লীজ চেজ হিম। বেশী দূর বোধ হয় যেতে পারেনি।

—আপনার ঠিকানাটা বলবেন ম্যাডাম?

—নিউ আলিপুর এরিয়া। এর বেশী জানার দরকার নেই। টাকা পাওয়া গেলে কাগজে অ্যানাউন্স করবেন। উপযুক্ত প্রমাণ নিয়ে আমি নিজেই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব।

প্রায় তিনদিন পর মুম্বায়ের নিজস্ব ফ্ল্যাটে ফিরে এক কলাম বাই দশ সিএমের মত জায়গায় টাইমস অব ইণ্ডিয়ায় একটা নিউজ পায় রোজি। নিউজটা এই রকম ঃ এক অজ্ঞাত নামা যুবক কোন মহিলার আড়াই লক্ষ টাকা আত্মস্যাৎ করে পালাবার সময় পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। ঐ একই রাতে ডাক্তার মিসেস তটিনী চৌধুরী এবং অরুন্ধকান্ত রায় নামে এক ভদ্রলোককে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। উভয়েরই পাকস্থলীতে পর্যাপ্ত অ্যালকোহল এবং বিষাক্ত বিষের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। উল্লেখযোগ্য, পুরুষটির ভিসেরায় বিষ ছাড়াও মাথায় উণ্ড্ দেখা যায়। খুব ক্লোজ রেঞ্জ থেকে কেউ তাঁকে মদ্যপানরত অবস্থায় খুন করেছে বলে পুলিশের অনুমান। পুলিশ দুটি ঘটনার মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে পাওয়ায় কেসটির তদন্ত চলছে। পুলিশের পক্ষ থেকে গোয়েন্দা বিভাগের ডিসিডিডি জানাচ্ছেন, জোর তদন্ত চলছে। আততায়ী খুব শিগগীরই ধরা পড়বে।

কাগজটা মুড়ে পাশে রেখে দিতে দিতে রোজি ভাবে, সত্যি কী পুলিশ কোনদিনও আততায়ীর সন্ধান পাবে? এই এতোগুলো খুনের সত্যিকার আততায়ী কে?

চক্ষুশূল

অবশেষে সদানন্দকে সিদ্ধান্ত নিতেই হয়। এক ঝাঁপিতে যেমন সাপ আর নেউল থাকতে পারেনা ঠিক তেমন সদানন্দ আর সুশীলার পক্ষে একই ছাদের নীচে থাকা সম্ভব না !

সদানন্দ বরাবরই শান্তিপ্রিয় লোক। ছোট বেলা থেকেই সে পড়াশুনো নিয়ে থাকতো আর কচিৎ কখনো খেলার মাঠ। তাও নিরীহ সব খেলা। হয় ব্যাডমিণ্টন না তো টেবিলটেনিস। ইনডোর গেম বলতে ক্যারাম নয়তো লুডো। আর একটা খেলা সে জানতো, দাবা। সদানন্দ এই খেলাতে ছিল বিশেষ পারদর্শী। তবু পড়াশুনোতেই বিশেষ মনোযোগ থাকায় কোন পরীক্ষাতেই সে প্রথম ডিভিশান থেকে নেমে আসেনি।

সদানন্দ দেখতে সুপুরুষ। সাধারণ বাঙালির হাইট হলেও তার চেহারায় এমন একটা আভিজাত্যের ছাপ ছিল যা সহজেই আর পাঁচজনের থেকে তাকে মুহূর্তে আলাদা করে নেওয়া যেত। একমাথা কালো কোঁকড়ান চুল। টিকোল নাক, চাপা ঠোঁট, গ্রীসিয়ান চিবুক। ধবধবে ফর্সা আর ছিপছিপে শরীরে সে বহু কুমারীর হৃদয় জয় করেও নিজের গোবেচারা গতিবিধির জন্যে কোন কুমারীর হৃদয়ে বেশীদিনের জন্যে জায়গা করে নিতে পারেনি।

এর জন্যে তার কোন মানসিক প্রতিক্রিয়া ছিল না। কারণ মেয়েদের সম্বন্ধে তার তেমন বিশেষ কোন দুর্বলতা ছিল না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকগুলো ডিগ্রি কবজায় আনার পর যথারীতি সে একটি ভালো চাকরি পায়। মনোযোগী ছাত্রের মতো নিষ্ঠাবান চাকুরে হওয়ার দৌলতে, এবং দক্ষতা দেখিয়ে সে একসময় এক বড় মাপের মালটি ন্যাশান্যাল ফার্মের হাই একজিকিউটিভের চেয়ারটিতে বেশ জাঁকিয়ে বসে।

এ তাবৎ সব যেন ঘড়ির কাঁটার মাপে চলেছিল। কিন্তু ভাগ্য বোধহয় সব কিছুই এক ব্যক্তির বরাতে ঢেলে দেয় না। সদানন্দকেও দিল না। তার শান্ত, মসৃণ গতিতে গড়িয়ে চলা জীবন বড় সড়ো একটা পাথুরে ধাক্কায় প্রায় এলোমেলো হয়ে গেল।

বহু লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করার পর নিরীহ নির্বিবাদী সদানন্দকে ডিসিশান নিতে হোল সুশীলাকে তার জীবন থেকে সরিয়ে দিতে হবে। তার মসৃণ জীবনে জগদ্দলের মতো মূর্তিমান বিভীষিকা সুশীলাকে সরিয়ে দেওয়ার একটাই মাত্র পথ। পথটি খুবই জটিল এবং ঝুঁকি সাপেক্ষ। কিন্তু পথ ঐ

একটাই। সুশীলাকে খুন হ'তে হবে। নইলে তাকেই সব কিছু ছেড়ে কোথাও চলে যেতে হবে। সেটা সম্ভব নয়। প্রথমত সোনার চাকরি, দ্বিতীয়ত, সে যেখানেই থাকুক সুশীলা এমনই এক মহিলা তার পক্ষে সে পৃথিবীর যেকোন সাধু আবাসে নিজেকে লুকিয়ে রাখুক না কেন সুশীলা তাকে সেখান থেকে খুঁজে বার করে আনবে। এবং চূড়ান্ত হেস্তনেস্ত করবেই। অতএব সুশীলার হাত থেকে নিস্তার পেতে গেলে ওকে খুন করা ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন রাস্তা নেই।

বিয়ের আগে, সুশীলাকে দেখাদেখিব সময় বেশ ভালোই লেগেছিল। অধিকাংশ যুবকের মতো অন্য সব কিছুর আগে সে ট্যারা চোখে দেখে নিয়েছিল তার শরীরের মাপ আর মুখশ্রী।

হতাশ হওয়ার মতো কিছুই ছিল না। মুখের মধ্যে অসাধারণ কোন ছটা না থাকলেও এক নজরে দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো লাবণ্য ছিল। সারা মুখে ছিল যৌবনের ইঙ্গিত আর ছিল ভারী মিষ্টি মিষ্টি একটা ভাব। পানপাতার মতো মুখ। কোঁকড়ানো চুলের ঢল পান পাতাকে আরও সজীব আর প্রাণবন্ত করে রেখেছে। গায়ের রঙটি মিঠে কড়া। ঐ মুখ দেখার পরই সদানন্দ ঠিক করে নেয় এই মেয়েকেই সে বিয়ে করবে।

খেতে না পাওয়া ছিপছিপে নয় আবার দুধ ছানা ঘিয়ের দৌলতে চর্বি তরঙ্গ তাকে স্থূলকায়া করেনি। এক কথায় প্রথম দর্শনেই সদানন্দের চোখে সুশীলার 'কনে পাশ' হয়ে গিয়েছিল।

সদানন্দের বুজম্ ফ্রেন্ড, শ্যামলকান্তিকে সঙ্গে নিয়েই সে প্রথম পাত্রী মনোনয়নে যায়। শ্যামলকান্তি কী একটা কথা তোলার চেষ্টা করে। সম্ভবত লেখাপড়ার প্রসঙ্গ টানতেই চেয়েছিল। কে জানে কোথেকে কী বাগড়া পড়ে। সদানন্দ প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে ঐ প্রসঙ্গ ধামাচাপা দিয়ে দেয়।

শুভবিবাহ কার্য নির্বিঘ্নে মিটে যাবার পর সদানন্দ প্রথম তিক্ততার স্বাদ পায় ফুলশয্যার রাতে। সবাই চলে গেছে। নিমন্ত্রিত এবং রসিক বন্ধুরাও। এখন ঘরে কেবল মাত্র সদানন্দ আর সুশীলা। এখন কী আড়িপাতা তুতো বৌদি শালীরাও যে যার ঘরে ফিরে গেছে।

সদানন্দ স্বাভাবিক কারণেই সংকোচের মধ্যে ছিল। তার জীবনে প্রথম নারী সান্নিধ্য। প্রাকবিবাহিত জীবনে অনেকেই আসতে চেয়েছিল। স্বভাব লাজুকতায় সে সব টেকেনি। এমন কী বাসরঘরে সদানন্দের কোন এক পিসতুতো বোন শিখা একটু বাড়াবাড়ি করেই ফেলেছিল। ফস্ করে বলে দিয়েছিল, লোকলজ্জার বালাই না রেখে, বৌদি আমার বরের সঙ্গে তোমার বরটিকে পাল্টাপাল্টি করে নেবে?

সুশীলা কটমটিয়ে তাকিয়ে ছিল কিনা জানা যায়নি। কিন্তু শিখা তারপর থেকেই নীরব প্রতিমা।

যাইহোক অতীব সংকোচ নিয়ে সে বিছানার এক পাশে গিয়ে প্রায় জড়দগবের মতো চুপ করে বসে বসে ভাবছিল কীভাবে কথা শুরু করা যায়। বেশীক্ষণ ভাবতে হয়নি, নিজেই নিজের ঘোমটা সরিয়ে প্রায় আক্রমনের ভঙ্গীতে সুশীলা প্রশ্ন করেছিল, ঐ মেয়েটা কে?

হকচকিয়ে সদানন্দ জিজ্ঞাসা করেছিল, কোন্ মেয়েটা?

—ন্যাকামী কোরনা। ঐ ঠোঁট কাটা বাসর মাতানো চুলবুলে মেয়েটা। নির্লজ্জের মতো যে বলল বর পাল্টাপাল্টির কথা।

সদানন্দ সত্যিই তাকে তেমন চিনতো না। ও সহজ ভাবেই বলল, আমি ঠিক চিনিনা। তবে শুনেছি বিবাহিত মহিলারা ঐ ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করে। ঠাট্টা ইয়ার্কি'ও করে। ওতো কথার কথা।

—চুপ করো, প্রায় দাপানো আদেশ, কথার একটা মাত্রা থাকা দরকার। সত্যি বলছ তুমি ওকে চেননা, নাকি আগে থেকে কিছু ঘটঘট পাকিয়ে রেখেছ?

সদানন্দের ফুলশয্যার ফুল তখন শুকিয়ে যাবার দাখিল। এসব কী বলছে তার সদ্যবিবাহিতা পত্নী! কিন্তু নতুন বউ, বিশেষ কিছু বলাও যায় না। আর সেটা সদানন্দের স্বভাব বিরুদ্ধ। প্রসঙ্গ পাল্টাবার কারণে বলেছিল, আমি সত্যিই ঐ মহিলাকে এর আগে কোনদিনও দেখিনি।

—ভণ্ডামি অন্য জায়গায় করবে, তাই যদি হয় তাহলে ও বাসর ঘরে এলো কেমন করে?

—নিশ্চই কেউ ওকে নেমতন্ন করেছে। আমার খুড়তুতো বোনেদের কারো বন্ধুও হ'তে পারে। কিম্বা দূর সম্পর্কে কোন আত্মীয়া হ'তে পারে।

—পাড়া জ্বালানি মেয়ে। ছ্যাঃ। আর কোনদিন যেন এ বাড়িতে ওকে না দেখি।

সদানন্দ তখনি প্রমাদ গুনেছিল। এ মেয়ের মনের জটিলতার তল পাওয়া তার পক্ষে খুব একটা সহজসাধ্য ব্যাপার হবে না।

যাইহোক হুলের দংশন নিয়েই ফুলশয্যার রাতটা কেটে গিয়েছিল। আর ভালোয় মন্দয় আরও একটা মাস।

তারপর। বাড়িতে কাকচিল বসারও কোন সুযোগ ছিল না। এক সপ্তাহের মধ্যেই নববধূ একটি তালিকা ফেলে দিয়েছিল তার সামনে। অফিসের গাড়ি আসে নটার মধ্যে, অতএব নটায় অফিস গমন। সাড়ে দশটায় বাড়িতে ফোন করতে হবে। দেড়টায় সুশীলা ফোন করে জানবে টিফিন খাওয়া হয়েছে কিনা। পাঁচটায় ছুটি, ঠিক সাড়ে পাঁচটায় অফিসের গাড়িতে বাড়ি ফিরে আসতে হবে।

এ রুটিনের ফিরিস্তি না থাকলেও, একমাত্র সাড়ে দশটায় ফোন করা ছাড়া

আর সবগ্নলোই সদানন্দ করে আসছিল এতদিন। সদানন্দ ভাবল, এর জন্যে আবার রাজকীয় ফরমাস দেবার কী হ'ল? তব্ন সে মিষ্টি হেসে স্নশীলাকে কাছে টেনে আদর করে কিছ্ন বলতে গিয়েছিল।

কিন্তু সর্পদংশনে তাকে পিছিয়ে আসতে হয়েছিল। খ্যানখেনিয়ে স্নশীলা বলেছিল, এত বেহায়াপনা কেন, অ্যাঁ? লোকলজ্জার বালাই পর্যন্ত জানো না। ঝি চাকরদের সামনে আহ্লাদ না করলে ব্নঝি চলছে না। লেখাপড়া জানা মান্নষের যে এত নিলাজ প্রব্নত্তি হয় তা আমার জানা ছিল না।

বলেই দ্নপদাপ শব্দ তুলে স্নশীলা অন্যত্র চলে গিয়েছিল।

আর একদিনের ঘটনা। সদানন্দ সবে অফিস থেকে এসে সোফায় পরিপাটি করে বসেছে। অফিসের ড্রেসটা তখনও ছাড়া হয়নি। ভেবেছিল একেবারে চা খেয়ে, চেঞ্জ করবে। ইতিমধ্যে কাজের মেয়ে অস্টাদশী এক তর্নণী, কি কারণে বৈঠকখানায় এসেছিল, ওকে দেখে সদানন্দ চা আনতে বলে।

ঠিক সেই ম্নহ্নর্তেই স্নশীলা ওপর থেকে নেমে আসছিল। তারও হাতে চায়ের কাপ। কোথা থেকে কী? এক টানে হাতের কাপ ছ্নঁড়ে ফেলে দেয় মেঝের ওপর। ঝন্ঝন্ শব্দে কাপডিস টুকরো। তারপরই কণ্ঠস্বরের ঝনঝনানিতে বৈঠকখানা গরম, কেন? কচি মেয়ের হাতের চা না খেলে ব্নঝি আরাম হয় না? আমার হাতের চা কী এরই মধ্যে তেতো লাগতে শ্নর্ন করে দিয়েছে?

সদানন্দের তখন ইচ্ছে হয়েছিল ছাদ ফুড়ে আকাশে উড়ে যেতে। কিছ্ন বাক্য ব্যয় না করে ও সোজা ওপর উঠে যাচ্ছিল। আবার কণ্ঠনিনাদ, বলি, কথার উত্তর দেবার কোন ইচ্ছে হয় না ব্নঝি? না দরকার নেই?

ইচ্ছে এর দরকার কোনটাই ছিল না। তব্ন সে বলেছিল, স্নশীলা, তুমি মাঝে মাঝে কী যে বলো তা তুমি নিজেই না জেনে বল। দেরী হচ্ছিল বলেই ওকে আনতে বলেছিলাম।

—কেন? ঘোড়ায় কী জিন চড়িয়ে আসা হয়েছে? নাকি আর কোথাও অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?

—তুমি তো জানোই সন্ধ্যের পর আমি সোজা বাড়ি চলে আসি। কোন অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখি না।

—কিতার্থ করে দিয়েছ।

তারপরই আগাপাশতলা ধ্নলো ঝাড়া শ্নর্ন হয় মেয়েটির। কিন্তু সেও তুখরা। সেই বা ছাড়বে কোন স্নবাদে? ঝাঁঝিয়ে ওঠে, ও ভালোমানষের বউ, অত ঝাঁঝ দেখাচ্ছ কারে? দাদাবাব্ন কী আমার হাত পা ধরে টেনেছে নাকি? চেয়েছে তো এক কাপ চা। তার জন্যে এত কথা শোনানোর কী হল?

—ওরে হতচ্ছারি, দাদাবাবু সোহাগী, বড় দরদ দেখি। তোকে কী চা করার জন্যে রাখা হয়েছে ?

—তুমি কোথাকার হিংসুটে মেয়ে গা। এককাপ চা করে দিলে কী দাদাবাবুর চরিত্তিরে শ্যাওলা ধরে যাবে ? পুরুষমানুষকে এত সন্দেহ কোরনি। মিনসে তখন বারমুখো হয়ে যাবে।

আর যায় কোথা ? সুশীলা ক্রমশ দুঃশীলা হয়ে উঠতে থাকে। গলার পর্দা তিনশগ্রাম বাড়িয়ে বলে, বলি কদিন, অ্যাঁ, কদিন ধরে এই সব চলছে ?

—কিসেব কী চলছে ?

—পীরিত। যা করতে এ বাড়ি ঢুকেছিস।

গঙ্গা নামের কাজের মেয়েটি এরপর নিজমূর্তি ধাবণ করতে তিন সেকেণ্ড সময় নেয়। খনখনিয়ে বলে ওঠে, পোকা পড়বে গো, পোকা। যে মুখ দিয়ে অমন শিবতুল্য মানুষের নিন্দে কর সে মুখ আর কোন ভদ্দরলোক দেখবে নি। ছি, ছি, বলে কী গো। হ্যাঁগা বড় মানুষের বউ, আমার কী ভাতার নেই ? না সে মরদ নয় যে তোমার বরের পেছনে হেংলির মতো ঘুরে বেড়াব। যাক অত সাত কথায় কাজ নেই, আমার মাইনে পত্তর মিটিয়ে দাও, এ বাড়িতে আর এক দণ্ড নয়।

গঙ্গাকে বাখা যায়নি। আজকালকার কাজের মেয়েদের তরিবত করে চলতে হয়। পান থেকে চুন খসলেই, চললুম। আসলে এখন বোঝাই যায় না কে মনিব কে ঝি ?

সদানন্দ কিন্তু নির্বিকারই ছিল। ঝি চলে গেলে অসুবিধা সুশীলারই। শেষ পর্যন্ত অনেক টাকা মাইনে দিয়ে ময়না নামের এক বিগত যৌবনাকে রাজী করানো হয়। সদানন্দ ঠিক করেই নিয়েছিল কাজের লোকজনের ব্যাপাবে সে কোনদিনও নাক গলাবে না। চা কেন এক গ্লাস জল পর্যন্ত চাইবে না।

কিন্তু ভেতরে ভেতরে সদানন্দর সেই আনন্দিত ভাবটাই চলে যাচ্ছিল। চেহারার মধ্যে একটা শুকনো ভাব ফুটে উঠতে লাগল। তবু সে নিজের মনেই থাকবার চেষ্টা করতো। কিন্তু সেখানেও নিস্তাব পেল না। ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে একদিন ঠিক সন্ধ্যের মুখেই বাড়ি ফিরেছে, সুশীলা চেপে ধরল,

—তোমায় আজকাল কী দশায় ধরেছে ?

সদানন্দ প্রথমে বুঝতে পারেনি। বোকার মতো মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল।

—হাঁ করে দেখছ কী ? ভাজা মাছ ওল্টোতে জানোনা মনে হচ্ছে ?

—তুমি এখন ঠিক কী ব্যাপারে কথা বলছ সত্যিই আমি বুঝতে পারছি না।

—বুঝতে চাইছ না বল। এতো রুখু শুখু ভাব কেন ?

—এমনিই। শরীরটা ঠিক নেই।

—শরীর না মন ?

—কী বলতে চাইছ ?

—শুনতে চাইছি।

সেই প্রথম সদানন্দ প্রতিবাদ জানিয়েছিল, সুশীলা, নিজেকে একটু স্বাভাবিক করার চেষ্টা কর।

—তার মানে, তুমি কী মনে কর আমি পাগল ?

—না, পাগল নও, তাহলে অন্য ব্যবস্থা করা যেত। তবে এভাবে নিজের মনটনকে যদি ক্রমাগত নীচের দিকে নামিয়ে নিয়ে যেতে থাক তাহলে পাগল হওয়া কিছু বিচিত্র নয়।

—ও, তার মানে তুমি এখন থেকে আমায় পাগল করার চেষ্টায় আছো। আর আমাকে পাগল প্রমাণ করতে পারলেই নিজের কার্যসিদ্ধি হবে, তাইতো ?

—কার্যসিদ্ধি মানে ?

—আর একজন মনের মতো কাউকে নিয়ে আসবে।

সদানন্দ উঠে দাঁড়ায়। খানিকক্ষণ সুশীলার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে, এ রকম কোন ভাবনা আমার মাথার মধ্যে ছিলনা। আজ থেকে সেটাই তুমি ঢুকিয়ে দিলে।

—কী বললে ? তার মানে তুমি সত্যি সত্যিই আমাকে পাগল করতে চাইছ ?

সদানন্দ খানিকটা সময় নেয়। তারপর ধীরে ধীরে সুশীলার কাছে গিয়ে তাকে বলে, সুশীলা, আমি একটু সুখী হ'তে চেয়েছিলাম। লোকে সেই জন্যেই বিয়ে করে। কিন্তু তোমার অকারণ সন্দেহ, তোমার জটিল ভাবনা-চিন্তা, সত্যি বলছি, আমার লাইফটাকে হেল করে দিচ্ছে। বাড়ির একটা কাজের মেয়ে, ভাল করে আমি তার মুখটাও কোনদিন দেখিনি, তাকে নিয়ে এমন সব কথা বললে, মেয়েটা তোমারই নিন্দে করে এ বাড়ি থেকে চলে গেল। অফিসের পরও আমার কিছু কাজ থাকতে পারে, কিন্তু সাত তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে হয় তোমার অকথা কুকথার ভয়ে। আজ অকারণে তুমি আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার শুরু করেছ। এ গুলো কী সুস্থতার লক্ষণ ?

—বাজে জ্ঞান দেবার চেষ্টা কোর না সদানন্দ। ওসব কথার জোড়াতালি দিয়ে অন্য মেয়েদের ভুলোবে। সুন্দর দেখতে ছেলেদের আমি একদম বিশ্বাস করি না।

—তাহলে কুৎসিত কাউকে বিয়ে করলেই তো পারতে।

—কেন করব ? দেখ'তে রূপবান হলেই তাকে চরিত্রহীন হতে হবে ?

—এটা তোমার ভুল ধারনা। এ ধারনা পাল্টাও। নইলে,

—নইলে ?

—দেখতেই পাবে।

দেখাতেই চেয়েছিল সদানন্দ। একটা হেস্ত নেস্তই করতে চেয়েছিল। করেনি। কারণ সদানন্দর ধৈর্য অসীম। যথারীতি সে অফিস করে। অফিসের পর বাড়ি ফিরে কোনদিন বই পড়ে। কোনদিন টিভি দেখে। সেখানেও বিপত্তি শুরু। সুশীলা তখন ঘরে ছিল না। সদানন্দ টিভি খুলে বসেছিল। টিভিতে তখন সেমি অ্যাডাল্ট একটা সীন চলছে। নায়ক নায়িকাকে কাছে টেনে নিয়ে গভীর আবেগে চুম্বন করতে যাবে, হঠাৎই টিভির সুইচ অফ। সদানন্দ মুখ ঘুরিয়ে দেখে সুশীলা সুইচ অফ্ করে রোষনেত্রে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

—লজ্জাও করে না। আধ দামড়া বুড়ো, এখনও মন থেকে নোংরামি গেল না।

সম্ভবত সদানন্দ মৌনী নিয়েছিল। সে চুপ করে উঠে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সারা সন্ধ্যে কাটিয়েছিল।

না, বই পড়ারও উপায় নেই। টিভি দেখা ছেড়ে দেবার পর সন্ধ্যে কাটাবার জন্যে বইপড়া শুরু করল। কোথায় যেন ছিল সুশীলা। হঠাৎই ছোঁ মেরে ওর হাত থেকে বইটা তুলে নিয়ে প্রথম পাতাটা দেখে নিয়েই মুখ বেঁকাল।

—কী হোল, বইটা হাত থেকে নিয়েই বা নিলে কেন ? আর ওভাবে মুখই বা বেঁকালে কেন ?

—চরিত্রহীন। শরৎচন্দ্র। কেন আর কোন বই ছিলনা ? ছেলেমেয়ের কেচ্ছাকাহিনী না পড়লে চলে না বুঝি ? যেমন নিজে তেমনি তার বই পড়ার ঢং। ছ্যা ছ্যা।

একদিকে বইটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হন হন করে অন্যত্র চলে যায়। হাঁ করে কিছুক্ষণ ওর গমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সদানন্দ ভাবতে থাকে সে এখন যায় কোথায় ?

ওর আবাল্যের বন্ধু শ্যামলকান্তি। অনেকদিন থেকেই ভাবছিল ওর সঙ্গে একবার কথা বলা দরকার। শ্যামলকান্তি ব্যাংকে চাকরি করে। একদিন ডেকে পাঠাল ওকে ওর নিজের চেম্বারে। খুলে বলল সব কিছু। সব শুনে শ্যামল কিছুক্ষণ ধরে মাথা চুলকোল। তারপর সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, তুই মরেছিস !

—হ্যাঁ। একেবারে জলজ্যান্ত মৃত্যু। কিন্তু একটা উপায় বল। এভাবে চললে একদিন হয় আমি নয়তো ওর মৃত্যু সংবাদ পাবি। মানে ফিজিক্যাল ডেথ।

—একটা কাজ কর। ছেলে পুলে না হলে মেয়েরা অনেক সময় এরকম বাতিকগ্রস্ত হয়। তুই একটা বাচ্চা পয়দা কর।

—কর বললেই হয় নাকি? এইতো দ্যাখনা, দেখতে দেখতে তিনবছর হয়ে গেল। কোথায় বাচ্চা, কোথায় কী?

—ডাক্তার দেখিয়েছিস?

—দেখাবে না। ওর লজ্জা করে।

—তুই শালা পুরুষমানুষ না কী রে? বাচ্চা হচ্ছে না এটা তো একটা প্রবলেম। তার জন্যে তো ডাক্তার দেখাতেই হবে। ঠিক আছে লেডি গাইনির কাছে যা।

—লেডিদের চিকিৎসাশাস্ত্রে জ্ঞান কম।

—কে বলল?

—সুশীলা। ও এখন তন্ত্রমন্ত্র তুকতাক শুরু করে দিয়েছে।

—তোকে বাঁচায় কার বাপের সাধ্যি।

—কদিন ধরে আমি একটা কথা ভাবছি।

—কী?

—আমি খুন করব।

—সুশীলাকে?

—হ্যাঁ। কিন্তু কোন সহজ প্রক্রিয়া খুঁজে পাচ্ছি না।

—তোর মাথাটাও গেছে।

—তোরও যেতো।

—না, বলে কিছুক্ষণ ধরে পেপার ওয়েট নিয়ে নাড়াচাড়া করে শ্যামল বলল, এক কাজ কর, রোজ ছটার মধ্যে বাড়ি ফিরিস তো। এবার থেকে বেশ রাত করে বাড়ি ফেরা শুরু কর।

—তুই কী বাড়িতে দক্ষযজ্ঞ শুরু করাতে চাস?

—এদিকটা ভাবিনি। ঠিক আছে। রিভার্সটা কর।

—যেমন?

—চেনা জানা সব বন্ধু আর বন্ধু পত্নিদের রোজ সন্ধ্যেবেলা বাড়িতে ইনভাইট কর। আর সেই দলে ওকেও নিয়ে বসা। আমার মনে হয় পাঁচ জনের সঙ্গে মেলামেশা করলে ওর মনের এই সব জড়তা কেটে যেতে পারে।

কথাটা সদানন্দের মনে ধরে। বিশিষ্ট বন্ধুদের ফোনে ফোনে নিজের প্রবলেম জানিয়ে তাদের সস্ত্রীক ইনভাইট করে। সুশীলার সঙ্গে সবার আলাপ টালাপ করিয়ে দেয়। সদানন্দ সর্বদাই তটস্থ হয়ে ছিল ওদের সামনেই না আবার কিছু সীন তৈরী করে বসে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার সুশীলা আশ্চর্যরকম ভাবে অত্যন্ত সুশীল বালিকার মতো তাদের সঙ্গে

গল্প আড্ডায় মেতে গেল। এমন কী তাদের ঘনঘন চা পরিবেশনেও তার কোন বিকার নেই। সদানন্দ নিজেকে ধিক্কার দিল, ছিঃ, এতদিন এমন সহজ প্রক্রিয়াটা কেন তার মাথায় আসেনি। সঙ্গে সঙ্গে শ্যামলকান্তিকে জানিয়ে দিল, ওষুধ ধরেছে।

পনের দিন। বিবাহিত জীবনের এই পনের দিনের স্বর্গসুখে যখন সদানন্দর মনে এবং চেহারায় বিকশিত ভাব এসেছে, তাকে আরো নধর এবং উৎফুল্ল দেখাচ্ছে, ঠিক তখনি, এ্যাটাচি রেডি করে একদিন অফিস বেরুবার মুখে, মনে হল কানের কাছে যেন বোমা ফাটল, বলি আর কত নষ্টামি দেখব তোমার, অ্যাঁ?

সদানন্দ চমকে উঠেছিল। আমতা আমতা করে, নষ্টামি মানে? কী বলছ ঠিক বুঝতে পারছি না।

—এতো জেল্লা বেরুচ্ছে কেন? মুখে চোখে? নিত্যি পাটভাঙ্গা জামা-কাপড়? গায়ে গলায় সেন্ট মাখা? দামি দামি আফটার শেভ, ডিয়ো-ডোর‍্যান্ট, আমি কিছু বুঝি না, না?

সদানন্দর শান্ত এবং সদা আনন্দময় মেজাজে কে যেন পিন ফুটিয়ে দিল। অহেতুক বাক্যবানে এবার সে সত্যিই ধৈর্যচ্যুত হল। গলায় রুক্ষতা এনে সে বলল, কিসের কী বোঝ তুমি?

—প্রতি দিন এত সাজের বহর কেন? কে জুটেছে?

—আচ্ছা সুশীলা, তোমার মনে কী আর কোন চিন্তা আসে না? একটু ঠাকুর দেবতার কথাও তো ভাবতে পার?

—তা তো বটেই। নাহলে তোমার সুবিধে হবে কেমন করে? আমি ঠাকুর নিয়ে মেতে থাকব। যোগিনী হব, আর সেই তালে উনি মেয়ে মানুষ নিয়ে স্ফূর্তি করবেন। রোজ সন্ধ্যেবেলা বন্ধু আর বন্ধুর বউদের নিয়ে আড্ডা আরও জমে উঠবে! বলি কার বউকে দেখাবার জন্যে এত সাজের বাহার?

হঠাৎ কী যেন হয়ে যায় সদানন্দর। মাথা দপদপিয়ে ওঠে। চোখের কোনে উপচে পড়ে রক্তরাগ। শরীরের সমস্ত জোর এক সঙ্গে করে ঠাস করে একটি চড় কষায় সুশীলার গালে। এতোটার জন্যে তার কোন প্রস্তুতি ছিল না। সুশীলাও কোনদিন ভাবতে পারেনি সদানন্দ তার গায়ে হাত তুলতে পারে! চড়ের প্রচণ্ডতায় সুশীলা একদিকে ছিটকে পড়েছিল। সে দিকে তাকিয়ে সদানন্দ বলেছিল, এর পর আর কোনও দিন যদি এ ধরণের কথা বল, সেদিন আমার হাতে তুমি খুন হয়ে যাবে।

অদ্ভুত একটা পরিবর্তন দেখা দিল সুশীলার মধ্যে। এরপর থেকে সে প্রায় নির্বাক হয়ে গেল। কারোর সঙ্গে আর কোন বাক্যবিনিময় নয়। এমন

কী কাজের মহিলা ময়নার সঙ্গেও নয়। কেতোর সঙ্গেও না। কেতো কাজের লোক। জিনিষ পত্তর কেনা, বাজার করা, এসব সেই করে।

সদানন্দর খুব খারাপ লেগেছিল। অতীষ্ট হয়ে সে অনেকবারই সুশীলাকে মনে মনে খুন করেছে। করেছে তার হাত থেকে নিস্কৃতির কামনা। কিন্তু সত্যি সত্যিই সে মেরে বসবে এমনটা ভেবে উঠতে পারেনি।

স্বামী স্ত্রীর কথা বন্ধ। সুশীলা আর কোন ব্যাপারে নাক গলায না। সে তার শোবার ঘর আলাদা করে নিয়েছে। সদানন্দ একটু দ্বিধাগ্রস্ত হলেও ভাবে, এই ভাল। অন্তত বাক্যযন্ত্রনাটা কমলেও ঘরে শান্তি ফিরে আসে।

জোড়াতালি দিয়ে ভাববাচ্যে দিন কাটছিল। হঠাৎ সদানন্দ-গৃহে আবির্ভাব ঘটে লেখা বসুর। সুশীলার মামাতো বোন। মহিলাব বযেস বত্রিশ তেত্রিশ। থাকেন দিল্লীতে। ওখানেই বরুণ্ অ্যান্ড ব্রটাপ। অবিবাহিতা এক অধ্যাপিকা। কলকাতায় একমাত্র আত্মীয়া ঐ সুশীলা। কারণ সুশীলার পিতৃকুলে একটি মাত্র ভাই ছাড়া আর কেউ নেই। সেই ভাইও বিদেশে চাকবি নিয়ে সেটেল্ড্। অতএব ওঠার জন্যে একমাত্র সুশীলার বাড়ি ছাড়া লেখাব অন্য কোন স্থান নেই। সদানন্দর সঙ্গে লেখার আলাপ বিয়ের সময়। সেই সময় লেখা কয়েকদিনের জন্যে কলকাতায় আসে।

লেখা খুব একটা সুন্দরী নয়। কিন্তু স্বাস্থ্যবতী। উদগ্র না হলেও তার যৌবন সৌন্দর্য হেলাফেলা করা মত নয়। সোনালি ফ্রেমের চশমায মুখখানিকে বেশ চটকদার মনে হয়। লেখা শিক্ষিত এবং মার্জিত।

লেখা সরাসরি বাড়ি না গিয়ে হাওড়া স্টেশন থেকে তাদের বাড়িতে ফোন করে। সদানন্দই ফোনটা ধরে। প্রথমটায় চিনতে পারেনি। পরে বুঝতে পেরে ময়নাকে ডেকে বলে যায়, তোমার দিদিমণিকে ডেকে দাও। ওনার বোনের ফোন।

অফিসে বসে সদানন্দ ভাবতে থাকে তার শালীটিব এ বাড়িতে আসা কতটা সৌভাগ্যের অথবা দুর্ভাগ্যের। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কথাবার্তা নেই, এসব ক্ষেত্রে জোড়া দেওয়ার কাজে তৃতীয় ব্যক্তির সংযোগ মাধ্যম বেশ ফলপ্রদ। আবার তার স্ত্রীর স্বভাবটির কথা চিন্তা করে মন বিষিয়ে ওঠে। কারণ শেষ পর্যন্ত হয়তো শালীটিকে নিয়েই নতুন উৎপাত শুরু হবে।

এ ক্ষেত্রে দুটি ঘটনাই ঘটে গেল। লেখা আসার পর জীবনযাত্রা মোটামুটি স্বাভাবিক হ'তে শুরু করে। সুশীলাও কথা বলার লোক পেয়ে মোটামুটি সহজ হ'তে থাকে। সদানন্দ প্রথম প্রথম শালীটির সান্নিধ্য থেকে নিজেকে দূরে রাখার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু লেখা অন্য জল হাওয়ায় মানুষ। তার মধ্যে কোন সঙ্কোচের গুমোট কিছু ছিল না। নারীপুরুষের

স্বাভাবিক মেলামেশার মধ্যে যে কোন জটিলতার জন্ম হ'তে পারে এমন সংকীর্ণতা তার মধ্যে ছিলন। ফলে শালী জামাইবাবুর মধ্যে অচিরেই একটু মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠল।

লেখা বুদ্ধিমতী মেয়ে। কয়েকদিনের মধ্যেই সে বুঝতে পারল তার দিদিটির মধ্যে একটি মারাত্মক জটিল রোগ আছে। তার নাম সন্দেহ। সে প্রাণপণ চেষ্টায় থাকলো দিদিকে স্বাভাবিক করার জন্যে। কিন্তু হঠাৎ একদিনের ঘটনায় আবার তোলপাড়।

সন্ধ্যে বেলা ছাদে বসে লেখা আর সদানন্দ সুশীলাকে নিয়েই আলোচনা করছিল। সদানন্দ তার বিষণ্ণ জীবনের সব কিছুই লেখাকে জানিয়েছিল। সেই সন্ধ্যায় তাদের আলোচ্য বিষয় ছিল কোন মানসিক চিকিৎসক দিয়ে সুশীলাকে সারিয়ে তোলা।

সন্ধ্যার অন্ধকার। নির্জন ছাদ। একপুরুষ এক নারী গভীর আলোচনায় মগ্ন।

এহেন দৃশ্য সুস্থ দর্শককেও অন্য কিছু ভাবতে সাহায্য করে। সুশীলা নামক নারীটি যদি এ হেন দৃশ্য অবলোকন করে তার ফল কী হ'তে পারে তা সকলেরই অনুমেয়।

এ তাবৎকাল সুশীলা তার ক্ষুরধার বাক্যবাণে সদানন্দকেই অস্থির করে এসেছে। কিন্তু সেই সন্ধ্যায় যে বাক্য প্রয়োগ করে তা শোনার মত কান সম্ভবত সদানন্দরও তৈরী ছিলনা। লেখার তো নয়ই।

—তুই কী এ বাড়িতে খানকিগিরি করতে এসেছিস? দিল্লীতে বুঝি আর কোন বাবু ছিলনা? এখন বুঝতে পারছি কেন ঐ লোক আমায় কথায় কথায় খুন করার হুমকি দেয়!

সদানন্দর মনে হল সেই মুহূর্তে ভূমিকম্পে সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেলে সকলেরই মঙ্গল। আর লেখা আকাশ থেকে পড়ে। সে ভাবতেও পারে না কোন ভদ্রবংশীয় মহিলা এ হেন শব্দ বেশ চিৎকারের সঙ্গেই উচ্চারণ করতে পারে।

ইদানীং সদানন্দ প্রতিবাদ করা ছেড়ে দিয়েছিল। সে কোন কথা না বলে নীচে নেমে আসে।

লেখার বাংলা বলাটা খুব ফ্লুয়েণ্ট নয়। হিন্দী, বাংলা ইংরাজীর জগাখিচুড়ি মিশ্রিত ভাষায় লেখা কেবল বলে, ছিঃ দিদিজি, ক্যায়সা লেড়কি হো তু। তোর মুখে কী কুছুই আটকায় না? অ্যায়সা গন্ধি বাত্?

—না আটকায় না। কালই তুই এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবি। তোর ঐ পরের ভাতার খেকো মুখ যেন আমায় আর দেখতে না হয়।

সদানন্দ প্রথমে ডিভোর্সের করা ভাবে। কিন্তু উকিলমশাই এ ধরণের কেসে চট্ করে ডিভোর্সের আশ্বাস দিতে পারেন না।

অগত্যা সদানন্দকে খুনের ডিসিশানই নিতে হয়। আর, ঠিক তারপর পাঁচদিনের দিন সুশীলাকে তার বিছানায় মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। হাউস ফিজিসিয়ান ডাক্তার প্রণবেশ রুদ্র সুশীলাকে ভাল করে পরীক্ষা করার পর সদানন্দকে জানান, মিস্টার ঘোষ, আপনার ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান হিসেবে আপনার স্ত্রীর জন্যে কোন ডেথ সার্টিফিকেট দিতে পারছি না। আই থিংক দিস ইজ নট আ নরম্যাল ডেথ। প্লীজ রিপোর্ট টু লোক্যাল পুলিশ স্টেশন।

*　　　*　　　*

—ইজ ইট ভবানীপুর পুলিশ স্টেশন ?

—ইয়েস, স্পিকিং।

—মে আই স্পীক টু অফিসার ইন চার্জ ?

—জাস্ট হোল্ড অন।

একটু পরেই অন্য স্বর ভেসে এলো, ও সি বিকাশ তালুকদার স্পিকিং।

—নমস্কার স্যার। আমার বাড়িতে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। আমি বাড়ি ফিরে দেখি আমার স্ত্রী আনকনশাস অবস্থায় বিছানায় শুয়ে আছেন। আমার হাউস ফিজিসিয়ান ডিক্লেয়ার করেন, সি ইজ ডেড। এবং তিনিই আমাকে লোকাল থানায় রিপোর্ট করতে বলেন।

—আপনার নাম ?

—সদানন্দ ঘোষ।

—বাড়ির ঠিকানাটা বলুন।

বিকাশ তালুকদার সদানন্দ প্রদত্ত ঠিকানা লিখে নেন। তারপর বলেন, বডি রিমুভ করার চেষ্টা করবেন না। কোথাও কোন কিছুতে হাত দেবেন না। বাড়ির কোন লোককে বাইরে যেতেও দেবেন না। আমরা আসছি।

প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর নীলাঞ্জন ব্যানার্জি তখন থানাতেই বসে। বিকাশের কথাবার্তা শুনে একবার তার দিকে তেরছা দৃষ্টি ফেলে আবার সেদিনের টেলিগ্রাফটা ওল্টাতে শুরু করল। বিকাশের নজর এড়ায় না। ফোনটা নামিয়ে রাখতে রাখতে বলেন, এমন একটা ভাব দেখালেন ব্যানার্জি সাহেব যেন খুন খারাবির ব্যাপারে আপনার কোন ইণ্টারেস্ট নেই। ও সব কথা যেন শোনাও পাপ।

নীল নিরুত্তর পূর্ববৎ।

—আপনাকে আমি অনেকদিন দেখছি, কেন দাদা ভনিতা করছেন ?

—আমি কিছুই করিনি, কেবল টেলিগ্রাফের পাতা ওল্টাচ্ছি, বেশ গম্ভীর স্বরে নীলের সংক্ষিপ্ত উত্তর।

—বেড়াল যদি বলে তার মাছে অ্যালার্জি হয়েছে সেটা কী কোনভাবেই বিশ্বাসযোগ্য ?

—আমায় কী করতে বলছেন ?

—খবরের কাগজটা মুড়ে রেখে আমার সঙ্গে চলুন।

—আমি তো পুলিশে চাকরি করিনা। পুলিশের কেউ নই।

—খাতায় কলমে তাই। কিন্তু,

—নো কিন্তু। কেসটা পুলিশের। দায়িত্ব আপনার। আমি যাব কোন ঠ্যাকায় ?

—দেখুন ব্যানার্জি সাহেব, জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কেসে আপনি আমাকে সাহায্য করেছেন। আমি তার জন্যে সারাজীবন আপনার কাছে ঋণী এবং কৃতজ্ঞ।

—অতি বিনয় হয়ে যাচ্ছে। এক কাজ করুন। বধূহত্যা। চোখ কান বুজিয়ে কেসটা ফর্মুলায় ফেলে দিন। শ্বশুর, শাশুড়ি, দেওর, ননদ, হাজব্যান্ড যাকে যাকে সামনে পাবেন সোজা নিয়ে গিয়ে গারদে পুড়ুন। তারপর বাঁধা গতে ফেলে দিন। অসহায় বধূকে সকলে মিলে হত্যা করেছে। এখন আইন বধূর ফরে। বধূর দোষ থাকুক বা নাই থাকুক। বধূ হত্যার মতো সহজ কেস আর হয় না।

—ঠাট্টা করুন, ব্যঙ্গ করুন, সব মেনে নিচ্ছি। এর পেছনে একটা বিশাল চক্র কাজ করে তাও মেনে নিচ্ছি। কিন্তু কখনও কখনও তো ব্যতিক্রম ঘটে। আপনি কী বলতে চাইছেন সব সময়েই বধূ নির্দোষ আর সবাইকে আদালত জেলে পুড়ে দেয় ?

—আমার এখন তর্ক ভাল লাগছেনা।

—তাহলে উঠুন। আপনার চোখ বাজ পাখির মতো। একটা ছোট্ট সূত্রও আপনার চোখ এড়ায় না। প্লীজ চলুন। দেরী করে গেলে অনেক ইম্পট্যান্ট ক্লু হাত ছাড়া হয়ে যেতে পারে। আপনার শেখানো বুলিই কপচালাম। উঠুন ভাই, একটু নয় আমাকে হেল্প করলেন। বুড়ো হয়েছি, আর কটা বছর পর রিটায়ারমেণ্ট। আর জ্বালাব না কথা দিচ্ছি।

নীল হেসে ফেলে ওর কথা শুনে। তারপর কাগজটা মুড়ে পেপার ওয়েট চাপা দিয়ে বলে, এই জন্যেই আমি থানায় আসা ছেড়ে দিয়েছি। বিশেষ করে আপনার সঙ্গ, চলুন।

* * *

সদানন্দর বাড়িটা প্রতাপাদিত্য রোডের কাছে। সাবেকী বাড়ি, দোতলা। ছাদ আছে। বেশ প্রশস্ত ছাদ। বাড়িটাও বেশ ঝকঝকে। দোতলায় সামনের দিকে টানা লম্বা বারান্দা।

জীপ থেকে নেমে তালুকদার একবার আপাদমস্তক বাড়িটাকে জরিপ

করলেন। কোথাও কোন লোকের চিহ্ন নেই। মেন গেট ভেতর থেকে বন্ধ। নীলের দিকে তাকিয়ে তালুকদার বললেন, আসুন ব্যানার্জি সাহেব।

সঙ্গে দুজন কনস্টেবল ছিল। তাদের গেটের বাইরে দাঁড় করিয়ে তালুকদার কলিং বেলে চাপ দেন। মিনিট খানেকের মধ্যে মাঝ বয়েসী একটি লোক এসে দরজা খুলে দাঁড়ায়।

—এটাই কী সদানন্দ ঘোষের বাড়ি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—বাড়িতে আছেন তিনি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—গিয়ে বল আমরা থানা থেকে আসছি।

লোকটি খবর দিতে যাবার আগেই দেখা গেল সদানন্দ নীচে নেমে এসেছে।

—আসুন স্যার, আমি আপনাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। ওপরে যেতে হবে।

—হ্যাঁ, চলুন।

বিশাল মাপের ঘর। নানান রকমের আসবাবে ঘর প্রায় ভর্তি। খাট, সোফা, টিভি, বুকসেলফ, আলমারি, কী নেই। সবই আছে কিন্তু সবেতেই অযত্নের ছাপ। এক একটা ঘরের সাজগোজ দেখে বোঝা যায় সে ঘরের মালকিনের স্বভাব। পুরুষরা একটু এলোমেলো অগোছালো হয়। কিন্তু বেশীর ভাগ মহিলা, নিতান্ত অলস প্রকৃতির না হলে মোটামুটি ঘরটিকে সুন্দর করে রাখার চেষ্টা করে। তাছাড়া ঘরের আসবাব বলে দেয় মালিকের স্বচ্ছলতা কেমন। বিকাশ তালুকদার একবার নজর চালিয়ে দেন সব কিছুর ওপর। তারপর বলেন, বডি কোথায়?

—আজ্ঞে পাশের ঘরে।

—তাহলে এ ঘরে নিয়ে এলেন কেন?

—না, মানে, প্রথমেই একটা মৃত্যুদৃশ্য দেখানো.

—আপনার বাড়িতে আমরা নেমন্তন্ন খেতে আসিনি। চলুন ওঘরে।

পাশের ঘরটা বড় ঘরটিরও লাগোয়া ঘর। দুই পার্টিশনে ওয়ালের মাঝে বন্ধ দরজা। এ ঘরটি কিন্তু অপেক্ষাকৃত ছোট। ঘরের এক পাশে সিঙ্গল খাট। খাটে এক মহিলার নিষ্প্রাণ দেহ! পা থেকে বুক পর্যন্ত চাপা চাদর। খাটের পাশে একটা ছোট্ট টিপয়। অন্যান্য আসবাব বলতে একটি ড্রেসিংটেবিল। কিছু প্রসাধন সামগ্রী। তাও এমন কিছু নয়। পাউডার, সুগন্ধী তেল, সিঁদুর কৌটো। আধ টিউব বোরোলিন। মাথার কাঁটা, চিরুনী ইত্যাদি। অন্যদিকে ওয়ার্ডরোব টানতেই খুলে গেল। কিছু কাপড়,

সবই মেয়েদের শাড়ি। ঘরের এক কোনে ছোট্ট টুলের ওপর একটি অ্যারিস্টোক্র্যাট স্যুটকেশ। ছোট্ট টেবিলে দামী ট্র্যানজিস্টার। একটা কলম।

নীল আব বিকাশ তালুকদার এগিয়ে গেলেন সুশীলার দিকে। মহিলার বয়েস আনুমানিক পঁয়ত্রিশ। কোঁকড়ান কালো চুলের ঢাল ছড়িয়ে আছে বালিশের ওপর। মুখখানি অনেকটা প্রতিমার মুখের মতো। পান পান ধাঁচ, টানা টানা বড় চোখ। চোখ বোঝানো থাকলেও তা বোঝা যায়। সিঁথি উপচানো সিঁদুর। কিন্তু মুখের মধ্যে বিরক্তির ছাপ। দুই ভ্রুর ভাজে ভ্রুকুটির কুটিল বেখা। ঠোঁট দুটি ঈষৎ ফাঁক। চাদর চাপা থাকলেও মহিলা যে স্বাস্থ্যবতী সেটা বোঝা যায়। বডি দেখতে দেখতে বিকাশ জিজ্ঞাসা করেন, তাহলে ইনিই আপনার স্ত্রী?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

হঠাৎ নজর পড়ে ঘরের সংলগ্ন ঝুল বারান্দায় এক মহিলা আকাশের দিকে চেয়ে উদাস দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে।

—উনি কে? বিকাশ প্রশ্ন করেন।

—আমার শ্যালিকা। সুশীলার পিসতুতো বোন, লেখা বসু।

—হুঁ।

—তাহলে আপনি বলছেন আপনার হাউজ ফিজিসিয়ান এঁর মৃত্যুকে অস্বাভাবিক বলছেন?

—হ্যাঁ। ওনারই পবামর্শ মতো আপনাদের ফোন করি।

—আপনার নিজের কোন সন্দেহ হয়নি?

—কিসেব?

—ওঁর অস্বাভাবিক মৃত্যু হ'তে পারে।

—নাতো।

—উনি কী কোন অসুখ বিসুখে ভুগছিলেন?

—না।

—আপনাব বাড়িতে, আচ্ছা তার আগে বলুন, এটা কী আপনার নিজের বাড়ি?

—হ্যাঁ।

—আপনিই করিযেছেন?

—না। বাড়ি আমার ঠাকুরদার। আমার বাবা ছিলেন ঠাকুরদার ওনলি সন। এবং আমিও আমার বাবাব ওনলি সন।

—বুঝলাম। কতবছর আপনাদের বিয়ে হয়েছে?

—ছ বছর।

—আপনাদের ইস্যু কটি?

—আমাদের কোন ইস্যু ছিলনা।

—ডাক্তার দেখিয়েছিলেন।

—না।

—হোয়াই ?

—কি করব বলুন, আমি অনেক করে সুশীলাকে গাইনির কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ও কিছুতেই ডাক্তার দেখাতে রাজী হয়নি। তাবিজ মাদুলি মন্ত্রতন্ত্রেই ও বিশ্বাস করতো।

—সিলি এক্স্কিউজ।

—হ্যাঁ। আমিও তাই বলি।

—আপনাদের মধ্যে কোন কমপ্লিকেশন গ্রো করেনি ? আইমীন আপনাদের সম্পর্ক কেমন ছিল ?

চট্ করে এ প্রশ্নের উত্তর জোগালো না সদানন্দর মুখে। সে চুপ করেই রইল।

—মিঃ ঘোষ। মনে করবেন না আপনার প্রাইভেট জীবন সম্বন্ধে আমাদের অহেতুক কোন কৌতূহল আছে। এটা ইণ্ট্যারোগেসানের স্বার্থেই।

মুখটা একটু কাঁচু কাঁচু করে সদানন্দ বলে, আমাদের মধ্যে ওটারই অভাব ছিল।

—কী রকম ?

—সুশীলা আমাকে সহ্যই করতে পারতো না।

—কেন ?

—ও প্রচণ্ড রকমের সন্দেহপ্রবণ মহিলা ছিল। সত্যি কথা বলতে কী আমার বিবাহিত জীবনের ফুলশয্যার রাত থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের মধ্যে কোন শান্তি ছিলনা।

বিকাশ এবং নীল নিজেদের মধ্যে একবার তাকাতাকি করে নেয়।

—এর কারণ কিছু অনুমান করতে পারেন ?

—আগেই বলেছি ও ছিল বড় জেলাস। প্রচণ্ড রকমের সন্দেহপ্রবণ। ওর সর্বদাই ধারনা আমি কোন না কোন মেয়েব সঙ্গে প্রেম করছি।

—সত্যি সত্যি করতেন নাকি ?

—না। ওনার করে দেওয়া রুটিন ছাড়া আর আমার কোন ব্যক্তিগত জীবন ছিলনা।

—এ বাড়িতে আর কে কে থাকেন ?

—আমরা দুজন। দুটি ঝি চাকর এবং

—থামবেন না বলে যান।

—আমার শালী। তাও উনি বেশীদিনের জন্যে আসেননি। কলকাতায়

আর কোন আত্মীয় স্বজনের বাড়ি না থাকায় উনি দিন পনেরো হল আমাদের এখানে এসে উঠেছেন।

—এটা বিশ্বাস যোগ্য ?

—এ কথা কেন বলছেন ?

—না, এমনি।—কী ভাবে উনি মারা গেলেন সে সম্পর্কে কোন ধারণা কী আপনার আছে ?

—ঠিক বলতে পারব না, কেবল,

—কী কেবল ?

—আজ দুপুরে আমার অফিসে একটা ফোন গিয়েছিল।

—তখন কটা ?

—দুটো বেজে পাঁচ-এ।

—কে করেছিলেন ?

—অপারেটর বলল আমাব স্ত্রীর কণ্ঠস্বর।

—আপনাব স্ত্রীর কণ্ঠস্বর কী আপনার অপারে র জানেন ?

- হ্যাঁ সুশীলা আগে প্রাযই আমাকে ফোন করত। আসলে ও আমায় সব সময় চোখে চোখে রাখার প্ল্যানে চলতো।

—বুঝেছি, তাবপর ফোন পেয়ে আপনি কী করলেন ?

—আমি তো ফোন পাইনি। কারণ আমি একটু অফিসের কাজে বেরিয়েছিলাম।

- তাহলে খবরটা পেলেন কী ভাবে ?

—ঐ যে বললাম অপারেটরের কাছে।

—তাবপর ?

—অপারেটরের মুখে শুনলাম আমার স্ত্রী নাকি অসুস্থ। ফোন পেয়েই আমি বাড়ি ফিরে আসি।

—তখন কটা ?

—প্রায় সাড়ে চারটে। কারণ অফিসে ফিরে আসি চারটে নাগাদ। হাতের কাজ গুলো পি একে বোঝাতে লেগেছিল মিনিট দশেক। তারপর বাড়ি ফিরতে, হ্যাঁ ঐ রকম সময়ই লেগেছিল।

—এসে কী দেখলেন ?

—সুশীলাকে সবাই ঘিরে আছে। আর ডাক্তার রুদ্র গম্ভীর মুখে বসে আছেন। সম্ভবত আমার অপেক্ষাতেই।

—সেই সময় সুশীলা দেবীর আশে পাশে কারা ছিলেন ?

—চণ্ডী, ময়না, পিসিমা, লেখা আর পাশের বাড়ির রমলা বৌদি।

—আপনার পিসিমা কোথায় থাকেন ?

—আমার ঠিক দুটো বাড়ির পরেই। পিসিমার সঙ্গে সুশীলার বেশ ভাবটাব ছিল।

এই সব কথা চলাকালীন নীল একমনে সুশীলার মৃতদেহ এবং আশপাশের যা কিছু দর্শনীয় তা দেখে নিচ্ছিল। হঠাৎ ও মৃতার আঙুলগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে আরম্ভ করল। তারপর নিজেই একসময় প্রশ্ন করল, মিস্টার ঘোষ, আপনার স্ত্রী কী খুব ভাগ্যোটাগ্যে বিশ্বাস করতেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। শুধু ভাগ্য কী বলছেন, তুকতাক জড়িবুটি এসবেও অগাধ বিশ্বাস ছিল। দেখছেন না সব আঙুলেই একটা করে পাথর।

—হুঁ। ওপর হাতেও অনেক তাগাতাবিজও আছে। কিন্তু একটা আঙুলে, আই মীন বাঁ হাতের অনামিকায় কিছু নেই। ওটা কী খুলে রেখেছেন?

—তাতো বলতে পারব না। কারণ সুশীলার সঙ্গে আমার প্রায় মাস তিনেক কোন কথাবার্তা নেই। আমি জানিও না ও কখন কী করে।

—মাস তিনেক কথা বন্ধ? ঝগড়া টগড়া হয়েছিল নাকি?

লজ্জিত মুখে সদানন্দ বলে, হ্যাঁ স্যার। এ সব বলতেও খুব খারাপ লাগে। সবই ঐ সন্দেহ জাত কারণে।

—কী রকম?

—সন্ধ্যের পর আমি যদি কোন কারণে রাত করে বাড়ি ফিরি, সেদিন অশান্তির শেষ থাকতো না। অথচ বাড়ি ফিরে যদি টিভি বা কোন বইটই পড়ি, সেখানেও একটা না একটা অজুহাতে ঝগড়া শুরু করতো। বাধ্য হয়ে ঠিক করেছিলাম বন্ধুবান্ধবদের ডেকে এনে সন্ধ্যেটা বাড়িতেই ওর সঙ্গে কাটাব। তা সেটাও হ'তে দেয়নি। আমার বন্ধু পত্নী আর আমাকে নিয়ে সন্দেহ করে, যা নয় তাই গাল দিতে শুরু করে। ফলে আমিও আর রাগ সামলাতে না পেরে ওকে একটা চড় মেরেছিলাম। সেই থেকে,

—এ রকম চড় চাপড় কী আপনি প্রায়ই মারতেন?

—না না, সেই প্রথম সেই শেষ। তারপর লেখা আসার পর বেশ কয়েক দিন নিজে থেকেই আমার সঙ্গে কথা বলা শুরু করল। আবার সেই লেখাকে আর আমাকে জড়িয়ে একদিন ছাদে অকথা কুকথা শুনিয়ে দিল। তারপর থেকে আর আমি ওর ব্যাপারে কোন খবরই রাখতাম না।

—তার মানে, আংটির ব্যাপারটা আপনার অজানা। ঐ আঙুলে কী আংটি ছিল সেটা কী খেয়াল করতে পারেন?

—একটা হীরের আংটি ছিল সেটা জানি। তবে সেটা কোন্ আঙুলে পড়তো বা আদপেই পড়তো কিনা বলতে পারব না।

নীল কিন্তু সুশীলা দেবীর হাতটা তখনও ছাড়েনি। অনেকক্ষণ ধরে

খ‍ুঁটিয়ে খ‍ুঁটিয়ে আঙ‍ুলগ‍ুলো পরীক্ষা করছিল। একবার নাকটা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে কিছ‍ু একটা ঘ্রাণ নেবার চেষ্টাও করল।

—আপনার কী মনে হচ্ছে ব্যানার্জি সাহেব, কানের কাছে ম‍ুখ এনে তাল‍ুকদার জিজ্ঞাসা করলেন, হোমি সাইড অর স‍ুইসাইড ?

—কোন একটা সাইড তো নেবেই। তবে নরম্যাল নয় এটুক‍ু বলা যায়। তারপর নিজেই এগিয়ে গেল ডাক্তার র‍ুদ্রর কাছে। উনি একদিকে একটা চেযারে বসেছিলেন।

ডাক্তার র‍ুদ্র, আপনি তো এদের পারিবারিক চিকিৎসক ?

—হ্যাঁ, বলতে পারেন।

—বলতে পারেন এ কথা বলছেন কেন ?

—কারণ ছোট খাটো ব্যাপার হলে এঁরা অবশ্যই আমায় কল দেন। কিন্ত‍ু তেমন বড ধরণের কিছ‍ু হলে সেই বিষয়ের স্পেসালিস্টের কাছেই তো যাবেন।

—হ‍ুঁ। তা মিসেস ঘোষের কী তেমন কোন বিশেষ অস‍ুখ ছিল ?

—ছিল। ওঁর হার্ট খ‍ুবই উইক। যার জন্যে মিঃ ঘোষকে আমি সাজেস্ট করেছিলাম কোন হার্ট স্পেসালিস্ট দেখাতে। তারওপর,

—কী ?

—ওনাদের কোন ইস্য‍ু নেই। অনেকবার বলেও ছিলাম কোন গাইনির সঙ্গে পরামর্শ করতে, কিন্ত‍ু ওঁরা সেটাও করেননি।

হঠাৎ সদানন্দ বলে ওঠে, আমি তো আগেই বলেছি আমার স্ত্রী কিছ‍ুতেই ডাক্তার দেখাতে চাইতো না। একমাত্র ডক্টর র‍ুদ্র ছাড়া।

—এ ধরণের মানসিকতার কারণ যা দেখিয়েছেন সেটা কিন্ত‍ু বিশ্বাস যোগ্য নয়। অন্য কোন কারণ কী আপনার জানা আছে ?

এতক্ষণ লেখা বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। সদানন্দকে দোনামোনা করতে দেখে সেই এগিয়ে এসে বলে, একটা কারণ দিদিজি আমার কাছে বলেছিল। পহেলা দিনই।

—কী ?

—আমার দিদিজির একটা আইডিয়া হয়ে গিয়েছিল কি সদানন্দদা ওকে মার্ডার করতে চায়। আগর কোই আনজানে ডাক্তার ওকে পয়জন খাইয়ে মেরে ফেলে, দিস ওয়াজ হার মেইন টেরর। নীল বা বিকাশ লক্ষ্য করলেন লেখার বাংলাভাষায় কিছ‍ু গলদ আছে। ব্যাপারটা নেগলিজিব‍্ল্। নীল আগের কথার জের টেনে বলল। —তার মানে ডাক্তার র‍ুদ্রর দেওয়া ওষ‍ুধ ছাড়া উনি অন্য কোন ওষ‍ুধই খেতেন না। আচ্ছা ডাক্তার র‍ুদ্র, আপনি কী মিসেস ঘোষকে কোন মালিশ জাতীয় ওষ‍ুধ ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন ?

—নাহ্, তেমন কিছ‍ু তো মনে পড়ছে না।

—ওয়েল, নীল একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে জিজ্ঞাসা করল, আপনার কেন সন্দেহ হ'ল যে মিসেস ঘোষের মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয় ? কেনই বা আপনি পুলিশকে ইনফর্ম করতে বললেন ?

ডাক্তার রুদ্র খানিকটা সময় নীলের দিকে তাকিয়ে কিছু ভাবলেন, তারপর বললেন, এই মুহূর্তে কোন সাইনটিফিক অ্যাণ্ড ডেফিনিট রিজন্ হয়তো দিতে পারব না। বলতে পারেন আমার সিক্স্ সেন্স। কিছুটা অভিজ্ঞতা।

—সেটাই তো জানতে চাইছি।

আবার কয়েক সেকেণ্ডের নীরবতা। কিছু একটা ভাবতে ভাবতে বললেন, দেন ইউ হ্যাভ টু কাম টু মাই চেম্বার। কিছু কিছু কথা আছে যেগুলো বোধ হয় সবার সামনে বলা উচিত নয়। অ্যাট লীস্ট্ আপনাদের তদন্তের স্বার্থে তো নয়ই। তা এবার কী আমি যেতে পারি ?

তালুকদারই বললেন, অনেক ধন্যবাদ ডক্টর রুদ্র। প্রয়োজন পড়লে আমরা আপনার চেম্বারে আসব।

—অলওয়েজ ওয়েলকাম, বলে ডাক্তার রুদ্র চলে গেলেন।

নীলের দিকে তাকিয়ে তালুকদার বললেন, ব্যানার্জি সাহেব, আমরা কী এবার বডি পোস্ট মর্টমের জন্যে পাঠাতে পারি ?

—পুলিশ তার কাজ নিশ্চই করবে। মোটামুটি আমার যা দেখার তা দেখা হয়ে গেছে। তবে আমি পার্সোন্যালি এ বাড়ির সকলকে একটু ইন্ট্যারোগেট করতে চাই।

—ওহ্ সিওর।

তারপর বিকাশ সদানন্দর উদ্দেশে বলেন, মিস্টার ঘোষ। ডাক্তার রুদ্রের সঙ্গে একমত হয়েই আমরা আপনার স্ত্রীর মৃত্যুকে অস্বাভাবিক বলে মনে করছি। এক্ষেত্রে বডি পোস্টমর্টম করাতেই হচ্ছে। আমাদের কাজ শেষ হয়ে গেলে আপনি আইনমাফিক বডি ফেরত পাবেন। আর ইনি মিস্টার নীলাঞ্জন ব্যানার্জি, একজন ইনভেস্টিগেটর। উনি আমাদের তরফ থেকে আপনাদের কিছু প্রশ্ন করবেন। আশাকরি এ ব্যাপারে আপনারা ওঁকে কোঅপারেট করবেন।

পাশের ঘরে গিয়ে নীল প্রথমেই ডাকল সদানন্দর পিসিমাকে। ভদ্রমহিলার বয়েস হয়েছে। নিদেন পক্ষে ষাট তো হবেই। ছোট খাটো চেহারা। ধবধবে। একদা রঙ ছিল। এখন সেখানে বয়েসের কিঞ্চিৎ মালিন্য। মহিলার চোখে সোনালী গোল ফ্রেমের বাই ফোকাল।

—বসুন মাসীমা।

—কিন্তু বাবা, এ সব কী শুনছি। বৌমার নাকি অপঘাত মৃত্যু হয়েছে ?

—পুলিশ আব ডাক্তার সেই রকমই সন্দেহ করছে।

—তুমিও তো পুলিশের লোক।

—না। তবে পুলিশের বন্ধু বলতে পারেন।

—ঐ একই কথা। তা বাবা আমি এ ব্যাপারে কী বলব বল ?

—আপনি যে টুকু জানেন তাই বলবেন। আপনি তো দু তিনটে বাড়ির পরেই থাকেন ?

—হ্যাঁ।

—সদানন্দবাবুর সঙ্গে ওর স্ত্রীর কী খুব ঝগড়া হ'ত ?

—তা হ'ত।

—ঝগড়াটা কী নিয়ে ?

—ঐ যা হয়। নিজের ভাইয়ের ছেলে বলে বলছি না, সদুর বাপু স্বভাব চরিত্তির তেমন সুবিধের নয়। মেয়েদের সঙ্গে একটু ঢল ঢল ভাব বরাবরই। তা কোন্ বউ আর সে সব সহ্য করে। তাই নিয়েই চলত দিন রাত।

—ইদানীং তো কথাও বন্ধ ছিল।

—ঐ লেখা ছুঁড়ির আসার পর থেকেই। তা শালীই হোক আর যাই-ই হোক, সোমত্ত মেয়ে। তার সঙ্গে এত গদ গদ হবার কী দরকার ?

—আপনি নিজে তেমন কিছু দেখেছেন ?

—না। আমি আর কতটুকুই বা এ বাড়িতে আসতুম। ঐ বৌমাই যা বলতো।

—আপনি কী কোন মলম ব্যবহার করেন ?

—হ্যাঁ,, হাজার মলম।

—সদানন্দ বাবু নাকি প্রায়ই বলতেন ওর স্ত্রীকে খুন করবেন। সে রকম কিছু শুনেছেন নাকি ?

—সদানন্দ নিজেই তো আমার কাছে গিয়ে বলেছে, বৌমা নাকি এমন ব্যবহার করছে একদিন রাগের মাথায় বৌ কে খুন করেও দিতে পারে। তা বাবা বৌমা কী সত্যিই খুন হয়েছে ?

—আমরা এখনও জানিনা। তবে সত্যি মিথ্যে ধরাটাই তো আমাদের কাজ। ঠিক আছে, আর আপনাকে বিরক্ত করব না। আপনি বরং এ বাড়ির কাজের মেয়েটিকে একটু পাঠিয়ে দিন।

বৃদ্ধা চলে যাবার পর নীল বড় ঘরটা একটু ভালোভাবে ঘুরে ফিরে দেখতে লাগল। সম্ভবত ও কোন একটা বিশেষ কিছু খুঁজে পাবার চেষ্টা করছিল। এদিক ওদিক দেখতে দেখতে হঠাৎ একটি বিসদৃশ্য দৃশ্যে ওর দৃষ্টি আটকে গেল। এ রকমটা হবার কথা নয়। কিন্তু হয়েছে। যদিও পুরো ঘরখানা অগোছাল তবুও দেওয়ালে টাঙানো একটি ছবি অনেকখানি বেঁকে কাৎ হয়ে

আছে। ঘরে আরো অনেক ছবিই আছে। সেগুলোর মধ্যে কোন অসঙ্গতি নেই। কৌতূহল বশত ছবিটার নীচে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখতে পেলো ছবি এবং দেওয়ালের মধ্যবর্তী ফাঁকে কিছু একটা বস্তু আটকে রয়েছে। তখনও ময়না এসে পৌঁছয়নি। নীল চটপট ছবিটা সরাতেই একটি ছোট শিশি মাটিতে পড়ে গেল। মাঝারি আকারের একটা ছোট্ট শিশি। তার গায়ে লেখা আছে, পয়জন—নট টু বী টেকন্ ওরালি। বাইরে পায়ের আওয়াজ হবার সঙ্গে সঙ্গেই নীল শিশিটি পকেটস্থ করে নেয়। ময়না এসে ঘরে ঢোকে। নীল একবার ময়নাকে আপাদমস্তক দেখে নেয়।

পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশের মতো বয়েস। সারা মুখে বসন্তের দাগ। রঙ কালো। রোগা ডিগডিগে। মাথার চুলে পাক ধরেছে। এক কথায় কদাকার। ওকে দেখে নীল আপন মনে মাথা দোলাতে দোলাতে বলল, হুঁ।

—তোমার নাম ময়না ?

—হ্যাঁ বাবু।

—বোসো, তোমায় কটা কথা জিজ্ঞেস করি। এ বাড়িতে তোমায় কে এনেছে ?

—আজ্ঞে বৌদিমণি।

—আগে একটি কম বয়েসী মেয়ে কাজ করত। সে কেন চলে গিয়েছিল জান ?

—বাবু তার সঙ্গে ফস্টিনস্টি করত, তাই বৌদি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

—তুমি জানলে কী করে ?

—বৌদি বলতো।

—তোমার বাবুকে কী তোমার সেইরকম মনে হয় ?

—তেমন কিছু তো দেখিনি। তবে বাবুর এক বন্ধুর বউয়ের সঙ্গে দেখতুম খুব হাসি ঠাট্টা করতো। আর, না থাক।

—থাকবে কেন ?

—বাবু অনেক রাত পর্যন্ত তেনার ঐ শালীটিকে নিয়ে ছাদে বসে বসে গল্প করতো।

—তোমার বৌদি সে কথা জানতেন ?

—না। তিনি তো ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন।

—ঘুমের ওষুধ কী রোজই খেতেন ?

—তা বলতে পারবুনি।

—আচ্ছা তোমার দাদাবাবু কী কোনদিন তোমার বৌদিকে খুন করবেন এমন কথা বলেছিলেন ?

—একবার যেন বলেছিলেন মনে হচ্ছে।

—তুমি এ বাড়িতে কী কাজ কর ?

—রান্নাবাদে আর সবই করি ?

—রান্না কে করে ?

—বৌদিমণি।

—আজ সকাল থেকে কী তোমার বৌদিকে অসুস্থ দেখেছিলে ?

—সকাল থেকে একটু যেন আনমনা মনে হচ্ছিল। তবে রান্নাবান্না করার পর উনি তেনার খাতা নিয়ে বসলেন কী সব লিখতে। তারপর একটু গরম দুধ খেতে চাইলেন।

—দাঁড়াও। খাতায় লিখতে বসলেন বলছ ? কী খাতা ?

—তাতো বলতে পারবুনি। যখনি সময় পান, তেনার একটি খাতা আছে, তাতেই কী সব লিখতেন।

—সে খাতাটা কোথায় ?

—বলতে পারবুনি।

—গরম দুধ খেতে চেয়েছিলেন কেন ? রোজই খেতেন নাকি ?

—না ! আমাকে ডেকে বললেন, শরীরটা দুর্বল লাগছে তাই একটু গরম দুধ খাবেন।

—তুমি দুধ দিয়েছিলে ?

—হ্যাঁ বাবু। এক গেলাস।

—সেই গ্লাসটা কোথায় ?

—সেতো ধুয়ে আবার তুলে রেখে দিইছি।

—দুধ খাবার পর উনি দুপুরে কখন ভাত খেয়েছিলেন ?

হঠাৎ ময়না ফুঁপিয়ে ওঠে।

—কী হ'ল, কাঁদছ কেন ?

—আমার কাছে দুধ চাইলেন তখন সাড়ে বারোটা কী একটা হবে। তারপর আমি দুটোর সময় তিনাকে ডাকতে গিয়ে দেখলুম তখনও ঘুমুচ্ছেন। ভাবলুম আর একটু পরে ডাকব। তারপর আড়াইটের সময় ডাকতে গিয়ে দেখি,

ময়না আবার কান্না শুরু করল। নীল হাল্কা ধমকের সুরে বলল,

—এখন আর কেঁদে কী করবে। বরং কী দেখলে সেটাই বল।

—বড় বিভৎছ দৃশ্য বাবু। দেখি বৌদিমণি চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন। মুখটা কেমন যেন কাল্‌চে মেরে গেছে। আর ঠোঁটের দু পাশ দিয়ে রক্ত আর ফেনা গড়াচ্ছে। চোখ দুটো যেন ঠিক্‌রে বেইরে আসছে।

—হুঃ। তুমি তারপর কী করলে ?

—লেখা দিদিকে ডেকে আনলুম।

—কিন্তু আমরা এসে দেখলুম মুখে কোন রক্ত বা ফেনা লেগে নেই। ওগুলো কে পরিস্কার করল ?

—আমিও তো সেটা জিজ্ঞেস করছি, কে পরিষ্কার করল ?

—হুঁ, তা লেখা দিদি আসার পর তুমি কী করলে ?

—লেখা দিদি সব দেখে আমায় পিসিমাকে খবর দিতে বললেন। আমিও চলে গেলুম।

—তোমার দাদাবাবু কখন এসেছিলেন ?

—জানি না বাবু। আমার তখন মাথার ঠিক ছেলনা। আমি তখন এ বাড়ি সেবাড়ি খবর দিতে গেছি।

—আচ্ছা তুমি এবার যেতে পার। তোমাদের ঐ কাজের ছেলেটা, কী যেন নাম ?

—চণ্ডী।

—ওকে ডেকে দাও।

ইতিমধ্যে বিকাশ তালুকদার ঘরে এসে ঢুকেছেন।

—বডি পাঠাবার ব্যবস্থা করে এলাম। তা কী বুঝছেন ?

—সম্ভবত মার্ডার কেস। আপনাকে দুটো জিনিস খুঁজে বার করতে হবে।

—বলুন।

—মিসেস ঘোষের ডায়েরি লেখার অভ্যেস ছিল। ওটা পাওয়া খুবই প্রয়োজন। আর ওনার হাতের হীরের আংটিটা কোথায় সেটাও জানা দরকার।

—ওকে, আমি নিজে খোঁজ নিচ্ছি।

বিকাশ তালুকদার যাবার সঙ্গে সঙ্গেই চণ্ডীর প্রবেশ। বছর ত্রিশের মধ্যে বয়েস। রোগা রোগা চেহারা। টেবির বাহার আছে। পরণে শার্ট আর পাজামা।

—আমায় ডেকেছেন স্যার ?

—হ্যাঁ, তোমার নাম কী ?

—আজ্ঞে, চণ্ডীচরণ বারিক।

—এ বাড়িতে কদিন আছো ?

—সে অনেকদিন।

—তবু, কদিন ?

—তা ধরুন গিয়ে আঠারোয় এসেছি। এখন আঠাশ। মানে দশবছর।

—তার মানে তুমি আসার পর তোমার বাবু বিয়ে করেন ?

—হ্যাঁ। সে আমার ওপরই তো সব দায় দায়িত্ব তখন।

—তোমার বৌদির লোক কেমন ছিল ?

—আর বলবেন না স্যার। টেঁসে গেছে। তার সম্বন্ধে কুকথা বলতে নেই। কিন্তু মাইরি বিশ্বাস করুন ওর জন্যেই তো আমার লভারকে হারাতে হ'ল।

—সভার ? ও আচ্ছা, সেই আগে যে মেয়েটি এ বাড়িতে কাজ করতো ? তার সঙ্গে তোমার বুঝি,

কথা কেড়ে নিয়ে চণ্ডী বলে, কী বলব স্যার, গঙ্গা তো প্রথম প্রথম পাত্তাই দিত না। দেখতে ডাঁসা বলে খুব রোয়াব ছিল। ওর নাকি কে আবার একজন বর ছিল। বর না বর্বর কে জানে। শালা মাতাল। হেভি পেটাতো। তবে, আমার নামও চণ্ডী। শালী একদিন গেঁথে গেল। সবে বে থাব কথা পাড়বো, দিল মাল গেঁজিয়ে,

—কী রকম ?

—একদিন বাবু অফিস থেকে ট্যাড্ হয়ে ফিরে গঙ্গাকে এককাপ চা চেয়েছিলেন, ব্যাস, যেই না চা বলা, কোত্থেকে বৌদি ছুটে এসে মারলো ফোঁস। বাবুকে যাচ্ছেতাই খিস্তি। বাবু তো মাথা নীচু করে দে দৌড়। আর গঙ্গাকে যেই না আনসান্ বকতে শুরু করেছে, ওর নাম গঙ্গা, দিল তুলো ধোনা করে, বৌদির মুখের ওপর বলেদিল, রইল তোর কাজের পিণ্ডি, আমার টাকা মিটিয়ে দাও, আমি চল্লুম। গঙ্গাও গেল, আর আমারও কপাল পুড়ল। আর কি কোনদিন বিয়ে হবে ?

নীল বুঝল চণ্ডীকে এক কথা জিজ্ঞাসা করা মানে নিজের সাতকাহন ফিরিস্তি শোনাবে। তাই ছোটখাটো কয়েকটা প্রশ্ন করে ওকে ছেড়ে দিল। যার মর্মার্থ হচ্ছে, সদানন্দ মহাদেব তুল্য লোক এবং সুশীলাই পায়ের ওপর পা তুলে ঝগড়া করতো। অর্থাৎ সদানন্দের বিপক্ষে দুই, পক্ষে এক। এমন সময় লেখার আগমন। পরনে সবুজরঙ সালোয়ার কামিজ, হলুদ ওড়না।

—আসুন লেখা দেবী। আমি আপনার কথাই ভাবছিলাম। বসুন। লেখা একটা চেয়ারে গিয়ে বসে। তারপর খুব ধীর এবং শান্ত স্বরে বলে,

—আপনি জরুর আমাকে কুছু প্রশ্ন করতে চান। জানি এটাই তরিকা। আই মীন ইনভেস্টিগেশনকা নিয়ম। তো পহেলে মেরা ভি কুছ্ কহনা হ্যায়।

—বলুন।

—আমি দিল্লীতে বরণ্ অ্যাণ্ড ব্রটাপ। তাই আমার ল্যাঙ্গুয়েজ মে কুছ কুছ সময়ে হিন্দী আ জায়গা।

—ঠিক আছে, আপনি বলুন। আমি বুঝতে পারব।

—উস্ টাইমমে ম্যায় নে কুছ না বোলা পায়া।

—কখন ?

—দিদিজির হাতে একটো আঙ্গুঠি ছিল। আ ডায়মণ্ড রিং।

—হ্যাঁ আমার সেই রকমই অনুমান।

লেখা নিজের হাতটা তুলে ধরে বলে, এই সেই আঙ্গুঠি।

—সেকী, এটা আপনার কাছে এলো কেমন করে ?

—দিল্লীসে আনেকা বাদ, দিদিজি নিজেই হাত থেকে খুলে আমার হাতে লাগিয়ে দিয়েছিল। র‍্যাদার ইট ওয়াজ আ গিফ্‌ট অফ্‌ মাই এলডার সিস্টার।

—তা সে সময় আপনি কিছু বললেন না কেন?

—কিঁউ কি ঐ টাইমে আমি কুছু বললে আপলোগ সামথিং উল্টাপাল্টা মানে করবেন। কোই মিস্‌ অ্যান্ডারস্ট্যান্ডিং। হামি ভি কুছুই বুঝতে পারছিলাম না। এনিওয়ে, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু টেক দিস ব্যাক, আহ্যাভ নো ফ্যাসিনেশন অ্যাটঅল।

—না মিস্‌ বোস। আমার বা পুলিশের কোন দরকার নেই ঐ আংটির। কিন্তু ব্যাপারটা চোখে লেগেছিল তাই প্রশ্নটা তুলেছিলাম। আচ্ছা এবার আমি আপনাকে কয়েকটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করব।

—পার্সোন্যাল? কিজিয়ে, আই শ্যাল ট্রাই মাই বেস্ট টু স্যাটিসফাই ইউ।

—আপনি হঠাৎ দিল্লী থেকে এখানে এলেন কেন?

—দিল্লী আমার কাছে খুব বোর করছিল। তাছাড়া আফটার দ্য ডিমাইজ অব মাই পেরেন্টস্‌ ম্যায় নে বহুত এলোন হো গয়ি। উস্‌ লিয়ে আই ওয়ান্টেড টু মেক আ চেঞ্জ অব প্লেস। তো, কলকাত্তায় দিদিজি আউর সদানন্দদা ছাড়া মেরা কোই রিলেটিভ ইধার নেহি হ্যয়া। উসিলিয়ে। আগর আপনি যদি আমার জান পয়ছান হন, কী রিলেটিভ, দিল্লী এলে আপনাকে আমার বাড়িতেই রাখব। ইস্‌মে গলতি কেয়া?

—না, না, ভুলের কিছু নেই। এটাই তো হওয়া উচিত। তা আপনি একজন টিচার?

—ইয়েস। লেকচারার অব আ কলেজ। এই টাইমে দিল্লীতে বহুৎ গরমি আছে। অ্যান্ড মেরা ছুটি ভি বহুৎ য্যাদা পড়াহুয়া হ্যায়। সো আই হ্যাভ কাম হিয়ার টু স্টে ফর টু মান্হস্‌। লেকিন,

—লেকিন?

—আফটার দ্য স্যাড ডিমাইজ অব দিদিজি, আমি ভাবছি কী ফিন দিল্লী অর এনি আদার প্রভিন্সে ব্যাক করব।

—তা নয় যাবেন, কিন্তু এই মুহূর্তে সেটা সম্ভব হচ্ছে না।

—হোয়াই?

—কারণ আপনার দিদির মৃত্যু, নট নরম্যাল। আই থিঙ্ক দেয়ার ইজ সাম মিস্টিরিয়াস রিজ্‌ন্‌স। যতদূর শুনেছি মহিলার হার্টের অসুখ ছিল। হার্টের পেসেণ্ট যে কোন মুহূর্তে মারা যেতে পারে। কিন্তু,

—এনিথিং রং? আর ইউ সিওর দ্যাট হার ডেথ ওয়াজ এবনরম্যাল?

—ইয়েস ম্যাডাম। আচ্ছা, ময়নাই তো আপনাকে সুশীলা দেবীর মৃত্যু

সংবাদ দেয় ?

—হ্যাঁ। অ্যাণ্ড, আমি সঙ্গে সঙ্গে ওই ঘরে গিয়ে পেঁছিই।

—আপনি তখন কোথায় ছিলেন ?

—গ্রাউণ্ডফ্লোরে। আমার বেডরুমে।

—এসে কী দেখেন ?

—দিদিজি স্ট্রেইট শুয়ে আছে। অ্যাণ্ড্

—অ্যাণ্ড ?

—সারা মুখ ভেরী পেইনফুল, মনে হচ্ছিল। অ্যাণ্ড আ মিক্সচার অব ব্লাড অ্যাণ্ড ওয়াইট ফোম ওয়াজ কামিং আউট ফ্রম হার লিপ্‌স্।

—কিন্তু আমরা এসে দেখেছি সে সব কিছুই ছিলনা। তা সেগুলো কে পরিস্কার করেছিল।

এ পশ্নে লেখাকে সামান্য বিব্রত দেখায়।

—মিস্ বোস, আপনি যা জানেন, ফর দ্য সেক অব ইনভেস্টিগেশন, সত্যি কথা বলুন।

—সদানন্দ্‌দা ফিরে এসে প্রথমেই একটু শোর মচালেন। তারপর নিজেই ভিজে রুমাল দিয়ে দিদিজির মুখটা ক্লীন করে দিলেন।

—তারপর ?

—তারপর উনি ডাক্তার রুদ্রকে কল দেন।

—আপনার দিদির সঙ্গে আপনার জামাইবাবুর রিলেশান সম্ভবত ভালো ছিল না ?

—নো, নট অ্যাটল। র‍্যাদার ইউ কুড স্যে, দে ওয়্যার ওলওয়েজ ইন দ্যা ফিল্ড্ অব বিটার আর্থ।

—হোয়াই ? জানেন কিছু ?

—ইট ওয়াজ মাই দিদিজ ফল্ট্। আই মাস্ট স্যে। সি ওয়াজ ভেরী মাচ্ জেলাস অ্যাণ্ড সাসপিসাস। সদানন্দ্‌দাকে ভীষণ সন্দেহ করতো। ইভন্ আমাকে নিয়েই একদিন বহুৎ বুঢ়া কথা বলে দিল। হুইচ ইনসাল্টেড মী লাইক এনিথিং। আমি ডিসিশান নিই, আই হ্যাভ টু কুইট্ দিস হাউস ভেরী সুন।

—সদানন্দ বাবু লোক কেমন ?

—ভেরী গুড পার্সন। জেণ্টেলম্যান, পোলাইট অ্যাণ্ড গুড হার্টেড।

—তাহলে আপনার দিদি তাকে সহ্য করাত পারতেন না কেন ?

একটু নীরবতার অবকাশ কাটিয়ে লেখা বলে, আমার জিয়াজি আই মীন সদানন্দ্‌দা আপনারা তো দেখছেন ভেরী নাইস লুকিং পারসন। ওয়্যান্ কিলারের মতো ফিগার। সেই হিসেবে দিদিজি ইজ নট হিজ ম্যাচিং পার্টনার।'

এটাই কমপ্লেক্স। দিদিজির ধারণা সদানন্দদা ইভ্‌ন্‌ আমার সঙ্গেও প্রেম করে।

—ইজ ইট রং ?

—কী ব্যাপারে ?

—সদানন্দবাবুর আপনার ওপর কিছু দুর্বলতা আছে ?

—মাইট বী। এর কারণও একটাই, হি ইজ নট হ্যাপি উইথ হিজ ওয়াইফ।

—সদানন্দবাবুর পক্ষে তাহলে ওর স্ত্রীকে হত্যা করার বাসনা হতেই পারে। ওনলি টু গেট রীড অব হার।

লেখা চমকে তাকায় নীলের দিকে। তারপর আমতা আমতা করে বলে —এ আপনি কী বলছেন ? আই ডোন্ট থিঙ্ক্‌ সো। হি ইজ নট আ ম্যান অব দ্যাট টাইপ।

—কিন্তু বিপাকে পড়লে, বা নিজের ক্ষত বিক্ষত জীবনে আপনার উপস্থিতি সম্ভবত তাঁকে শান্ত জীবনের স্বপ্ন দেখিয়েছিল। তাই, মানুষের পক্ষেই তো যে কোন অন্যায় কাজ করা সম্ভব।

—আই ডোন্ট বিলিভ সো।

—আপনার দিক থেকে কোন দুর্বলতা ? এনি উইকনেস ?

—ইয়ে মেরা নিজি মামলা। প্লীজ ডোন্ট আস্‌ক্‌ মী এনিথিং লাইক দ্যাট। লেকিন ম্যায় ইয়ে ভি বোল্‌ সকতি, হি ওয়াজ ভেরী মাচ আন হ্যাপি ইন হিজ কনজুগ্যাল লাইফ। ভেরী বোর্ডাম অ্যান্ড টিডিয়াস।

—থ্যাঙ্কু, আর আপনাকে কিছু প্রশ্ন নেই। আপনি যেতে পারেন। বাট ডোন্ট লীভ দিস সিটি উইদাউট পোলিশ পারমিশান।

লেখা চলে যাচ্ছিল।

—মিস বোস, ওয়ান মোর কোয়েশ্চেন। আপনার দিদি কী কোন ডায়েরি লিখতেন ?

—মাইট বী, লিখতেন।

—সে ডায়েরিটা খুঁজে পাওয়া দরকার। ক্যান ইউ হেল্প আস ?

—আমি মাত্র কদিন এ বাড়িতে এসেছি। আমার পক্ষে তো সব প্লেস অব হাইডিং, চিনাও সোম্ভব নয়। এনিওয়ে, আপনি যখন বলছেন, আই শ্যাল ট্রাই মাই বেস্ট্‌।

লেখা চলে যাবার পর নীলের ভ্রূর ভাঁজে কয়েকটা ট্যারাবাঁকা দাগ ফুটে উঠল।

*　　　　*　　　　*

জীপে উঠে বিকাশ তালুকদার বেশ কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে থাকলেন। যেটা আদপেই ওর স্বভাবের বাইরে। ত্যারচা দৃষ্টিতে বিকাশকে একবার দেখে নিয়ে নীল বলল, :সবাইকে সব কিছু মানায় না তালুকদারবাবু।

—কী রকম ?

—যেমন উটের মুখে হাসি মানায় না তেমনি আপনার মুখে উটের গোমড়াপনা মোটেই সুখদৃশ্য নয়।

—অন্য সময় হলে আপনার কথায় প্রাণ খুলে হাসতাম। কিন্তু এখন পারছি না।

—তাইতো জিজ্ঞেস করছি, এনি ক্লু ?

তালুকদার একবার শুধু হাতেই মুখটা মুছলেন। গলায় একটা খুকখুক শব্দ করে বললেন, সদানন্দ ঘোষকে আমার অ্যারেস্ট করা উচিত।

—কেন ? সেরকম কিছু ডেফিনিট কনক্লুশানে পৌঁছেছেন ?

—আমি দুটো বস্তু আবিষ্কার করেছি মিসেস ঘোষের ঘর থেকে।

—কী ?

ব্যাকসীটে রাখা একটা খাম তুলে এনে তার থেকে একটা ফোটো অ্যালবাম বার করলেন। তারপর নীলের দিকে এগিয়ে ধরে বললেন, ভালো করে একবার ভেতরের ছবিগুলো দেখুন।

প্রথম দু তিনটে পাতায় কেবল মিসেস ঘোষের ছবিই ছিল। কোনটা ছেলেবেলার কোনটা কলেজের বান্ধবীদের সঙ্গে। চতুর্থ পাতায় এসে দেখা গেল কনের সাজে। কিন্তু ছবির ওপর আলতা বা অন্য কোন লালরঙ দিয়ে এলোপাথাড়ি আঁচড় কাটা। মনে মনে হুঃ বলে পরের পাতা উল্টোল। স্বামী স্ত্রী দুজনের ছবি। কিন্তু সেখানে কেবল মাত্র সদানন্দরই ছবি ছিল। মিসেস ঘোষের ছবি থেকে মুখটা কেটে বার করে নেওয়া হয়েছে। পরের পাতা থেকে যেখানে যেখানে দুজনের ছবি থাকার কথা সেখান থেকেই মিসেস ঘোষের ছবি অদৃশ্য। সব শেষের পাতায় কেবলমাত্র মিসেস ঘোষের ছবি। তার ওপর লেখা আছে, ও চায়না আমি ওর জীবনে থাকি। তাই নিজেকে বাদ দিয়ে দিলুম।

অ্যালবামটা ফেরৎ দিতে দিতে নীল বলল, বুঝলাম। তা আর কী প্রমাণ পেলেন ? এটা কিন্তু কিছু প্রমাণ করবে না।

ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসি ফুটিয়ে তালুকদার বললেন, এবার দেখুন এই চিঠিটা। বডি রিমুভ করার সময় মৃতার বালিশের নীচে পাওয়া যায়।

নীল চিঠিটা মোড়া অবস্থায় একবার দেখল। সাধারণ প্যাডের কাগজ নয়। মনে হচ্ছে কোন ডায়েরীর পাতা থেকে খুলে নেওয়া অংশ। হ্যাঁ ঠিক তাই। মোড়া খুলতেই তারিখ এবং সাল পাওয়া গেল। পুরনো সালের ডায়েরী। সতেরই জুন উনিশ শো নব্বই। চিঠি, তবে কাউকে উদ্দেশ্য করে লেখা নয়।

নীল পড়তে শুরু করল, 'আমি বেশ বুঝতে পারছি ও আর আমাকে

চায় না। বোধহয় আমাকে খুন করতে চাইছে। দু দিনের দুটো ঘটনায় আমার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছে। একদিন মাঝরাতে ও আমার মুখে বালিশ চেপে ধরে ছিল। আমি ঝট্‌কা দিয়ে উঠে বসতেই দেখলুম ও পাশ ফিরে শুচ্ছে। এমন একটা ভাব দেখালো যেন নিজের অজান্তেই এ রকম একটা কাণ্ড করে বসেছে। পরদিন জিজ্ঞেস করতেই ও যেন আকাশ থেকে পড়ল। সেই থেকে আমি আমার শোবার ঘর আলাদা করে নিয়েছি। আর একদিন রান্নাঘরে আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি তখন আন্দাজ করে ছিলুম। জিজ্ঞাসা করাতে, 'কিছু না, বলে বেরিয়ে গেল। তার কয়েক মিনিট পরই গ্যাসের বিশ্রি গন্ধে টের পেলুম সারা রান্নাঘরে গ্যাসের উগ্র গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। তাড়াতাড়ি করে উঠে দেখলুম হাই অবস্থায় ওভেনের দুটো নবই ওপেন করা। তার মানে আমি যে মুহূর্তে গ্যাস জ্বালাতে যাব সেই মুহূর্তেই আমার সর্বাঙ্গে আগুন লেগে যাবে। সদানন্দকে আমি আর বিশ্বাস করি না।'

পাতা শেষ। নীল ফিরিয়ে দিতে দিতে বলল, একটা ব্যাপার বোঝা গেল। অর্থাৎ উভয়ে উভয়ের কাছে সাপে-নেউলের সম্বন্ধে কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। কারণ সদানন্দর এবং লেখার ভারশানে ঐ সন্দেহ প্রবণ মহিলাকে নিয়ে সদানন্দ অতীষ্ট, আর এই লেখা থেকে বোঝা যাচ্ছে মহিলাও তার স্বামীকে বিশ্বাস করতেন না এবং আশঙ্কা করতেন স্বামীর হাতেই তার মৃত্যু হ'তে পাবে।

—ইয়েস, প্রায় সোল্লাসে তালুকদার বলেন, দ্যাট ইজ মাই পয়েণ্ট। আশঙ্কা করতেন স্বামীর হাতে তাঁর মৃত্যু হ'তে পারে। নাও ইউ সী দিস পেপার।

তালুকদার ঠিক ঐ একই ধরণের আর একটি ভাঁজ করা কাগজ এগিয়ে দিলেন। এটার তারিখ পাঁচই আগস্ট উনিশশো নব্বই।

আর একবার নীলের ভ্রূ কোঁচকাল। ভাব প্রকাশ না করে ও লেখাটা পড়তে শুরু করল, 'সকাল থেকেই আমার শরীর আর মন দুটোই খুব খারাপ। কিছুই ভাল লাগছে না। বুঝতে পারছি না লেখা কী চায়? সদানন্দকে? আমাকে বলছে না কেন? তাহলে নিজে থেকেই সরে যাব। কিন্তু আমার চোখের সামনে আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে ওরা এক ঘরে এক খাটে রাত কাটাবে তা আমি কেমন করে সহ্য করব?

এখন দুপুর বারোটা। শরীর খুব খারাপ লাগছে। বুকের মধ্যে একটা অস্বাভাবিক যন্ত্রনা হচ্ছে। ময়নাকে রান্না সামলাতে বলে শুয়ে আছি। কত কী সব মনে আসছে। বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। হঠাৎ চোখ খুলে দেখি ওরা দুজন, মানে লেখা আর সদানন্দ আমার বিছানায় দুজনে দুপাশে

বসে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। আমি উঠতে যাচ্ছিলুম। কিন্তু ওরা বাধা দিল। অনেকদিন পর সদানন্দ আমায় জিগ্যেস করল, আমি কেমন আছি? আমার কী হয়েছে? সদানন্দের মিষ্টি কথাও আমার কাছে সাপের নিঃশ্বাস বলে মনে হয়। ডাইনীটাও তাই জিগ্যেসা করল। আমি কোন উত্তর দিইনি। একটু পরে সদানন্দ লেখাকে বলল এক গ্লাস গরম দুধ আনতে। লেখা চলে গেল, সদানন্দ আমার মুখের দিকে অদ্ভূত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎই ও আমায় জড়িয়ে ধরে চুমু খেল। বাধা দিতে গিয়েছিলুম, পারিনি। ঘেন্না করছিল। কারণ ঐ একই ঠোঁটে ও আরও অনেক মেয়েকে চুমু খেয়েছে। লেখাকেও খেয়েছে।

একটু পরেই লেখা দুধ নিয়ে এল। দুধের রঙটা দেখে আমার কেমন যেন সন্দেহ হ'ল। তবে কী ওরা বিষ মেশানো দুধ খাইয়ে আমায় মারতে চাইছে? আমার সারা শরীর শিউরে উঠল। একটা মেয়েকে পাবার জন্যে নিজের স্ত্রীকে খুন করতেও সদানন্দর হাত কাঁপছে না। আর লেখাও পারল বোনের স্বামীকে কেড়ে নেবার জন্য বিষ মেশানো দুধ তুলে দিতে। তাহলে এ জীবন আর রেখে লাভ কী?

লেখার হাত থেকে গ্লাস নিয়ে সদানন্দ আমার মুখের কাছে ধরল। আমি একবার সদানন্দর চোখের দিকে চাইলাম। ভাবলেশহীন পশুর মতো চাহনী। লেখা অন্য দিকে তাকিয়ে ছিল।

তবু আমি বাঁচতে চেয়েছিলুম। কিন্তু সদানন্দ জোর করে আমার মুখটা হাঁ করাল। আর লেখা আস্তে আস্তে সব দুধটা আমার গলায় ঢেলে দিল।

আমার গলা জ্বলে যাচ্ছে। গলা থেকে পেট পর্যন্ত সব জ্বলে যাচ্ছে। আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না। আমি চিৎকার করতে চেয়েছিলুম। কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বের হচ্ছে না। আচ্ছা আমি কী মরে যাচ্ছি? ওরা কী সত্যিই আমায় বাঁচতে দিল না?

লেখা শেষ। পাতাটা মুড়ে তালুকদারের হাতে ধরিয়ে দিতে দিতে নীল বলল, অ্যাবসার্ড।

—কী অ্যাবসার্ড?

—না, কিছু না। তাহলে আর কী, সদানন্দ আর লেখাকে অ্যারেস্ট করুন।

—আপনার গলার স্বরে মনে হচ্ছে ব্যাপারটা আপনার মনঃপূত নয়।

সে প্রশ্ন এড়িয়ে নীল বলে, আচ্ছা মিস্টার তালুকদার, আপনি মিসেস ঘোষের ঘরখানা ভালো করে তল্লাসী করেছেন?

—হ্যাঁ, কেন বলুন তো?

—আমার একটা ডায়েরী খুঁজে পাওয়া দরকার।

—ডায়েরী ? কী ডায়েরী ?

—সেই খাতাটা, যাতে সুশীলা দেবী নিয়মিত কিছু লিখতেন। নিজের কথা, অন্যের কথা।

—না! তেমন কোন কিছু পেলাম না।

—আমি লেখা দেবীকে বলে এসেছি। খোঁজ করার জন্যে।

—লেখা দেবীকে ? তিনি নিজেই তো কালপ্রিট। পেলেও আপনাকে দেবে কেন ?

—দেবে। তার আগে আপনি সদানন্দকে অ্যারেস্ট করুন।

—এই মাত্র ঠাট্টা করলেন। আবার বলছেন,

—আমি সিরিয়াসলি অ্যারেস্ট করতে বলছি। আর একটা ব্যাপার খোঁজ নিন, আজ দুপুরে ঠিক কখন সদানন্দবাবু অফিস থেকে বেরিয়েছিলেন এবং ঠিক কটায় অফিসে ফিরে এসেছিলেন। আর লেখা দেবীই বা তখন কোথায় ছিলেন ?

* * *

এর মধ্যে একটা সপ্তাহ কেটে গেছে। সদানন্দকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। পোটমর্টম রিপোর্টও পাওয়া গেছে। সুশীলাকে দুধের সঙ্গে নাইট্রিক অ্যাসিড দেওয়া হয়েছিল। দেওয়ালে টাঙানো ফটোর পিছন থেকে পাওয়া ছোট্ট শিশির মধ্যেও পাওয়া যায় নাইট্রিক অ্যাসিডের নমুনা। বিকাশ তালুকদার নানাভাবে ইণ্ট্যারোগেট করেও সদানন্দর কাছ থেকে কোন স্বীকারোক্তি আদায় করতে পারেনি। সদানন্দ কেবলি বলেছে স্ত্রীর অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে সে মনে মনে তাকে খুন করার কথা ভেবেছিল। কিন্তু কোন ভাবেই সে খুনী নয়। খুন করার মতো সাহস বা মানসিক শক্তি তার নেই। মৃতার কষের গা বেয়ে গড়িয়ে আসা রক্ত মিশ্রিত ফেনা কেন মুছে ফেলা হয়েছিল সে প্রশ্নের জবাবে সদানন্দ জানায় ঐ বীভৎস দৃশ্য অনেকেই সহ্য করতে পারবে না বলেই সে ঐ কাজ করেছে। সদানন্দর অফিসে খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছিল সদানন্দ তখন সত্যিই অফিসের কাজে বাইরে যায়। এবং ফেরে চারটে নাগাদ। অফিসে আসার সঙ্গে সঙ্গেই সে লেখার ফোন পায়। সেই মত সে সাড়ে চারটের মধ্যে বাড়ি ফিরে এসে দেখে তার স্ত্রী মৃত।

গলদঘর্ম বিকাশ তালুকদার হাঁফাতে হাঁফাতে নীলের বৈঠকখানায় এসে ঢোকেন। নীল তখন ক্রাইম ডিটেকসনের ওপর লেখা মর্ডান একটা বই নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। তালুকদারকে দেখে নীল বলল, আসুন মিস্টার তালুকদার। এবার বলুন আপনার মহামান্য ক্রিমিন্যালকে কতটা ফাঁসাতে পারলেন ? চার্জশীট তৈরী ?

—ফাঁসানোর কথা বললেন কেন ? আপনার কী মনে হচ্ছে আমি কোন নিরপরাধকে ধরেছি এবং জুলুম করছি ? তাছাড়া আপনিও তো সেদিন বললেন মিণ্টার ঘোষকে অ্যারেস্ট করতে ?

—আমি কেন বলেছি সে প্রশ্নের জবাব নিশ্চই দোব। কিন্তু তার আগে বলুন সদানন্দ ঘোষ যে অপরাধী এটা প্রমাণ করার জন্যে আপনার হাতে কী কী অস্ত্র আছে ?

—সুশীলা দেবীর লেখা কাগজগুলোই কী যথেষ্ট নয় ? জানেন তো মৃত্যুকালে সাধারণত কোন মানুষই মিথ্যে কথা বলতে চায় না। তাও কিনা তার স্বামীর বিপক্ষে।

—ঐ কাগজগুলো ছাড়া আমাদের কাছে আর কী প্রমাণ আছে ?

—তার পিসিমা বলছে তার চরিত্র ভালো নয়। বাড়ির ঝি বলছে সদানন্দ নিজের মুখেই চিৎকার করে বলেছে সে তার স্ত্রীকে খুন করবে। এমন কি সে নিজেও তা বলেছে।

—খুন করার মোটিভ কিছু খুঁজে পেয়েছেন ?

—খুব সোজা। ভদ্র মহিলা সদানন্দর মহিলা প্রীতিতে ক্ষুব্ধ। তার ফলে উভয়ের মধ্যে কোন সদ্ভাব ছিল না। খিটির-মিটির লেগেই থাকতো। সদানন্দ মুক্তির উপায় খুঁজছিল। এমন সময়ে ঘটনাস্থলে হাজির লেখাদেবী। আই থিঙ্ক ওদের মধ্যে কোন অ্যাফেয়ার্স তৈরী হয়েছিল। মিলনে বাদ সাধছিল সুশীলা দেবী। অতএব তাকে সরিয়ে দাও। এটাই কী মোটিভের পক্ষে জোরালো নয়।

—বাট, সদানন্দ হ্যাজ আ সলিড অ্যাণ্ড কংক্রীট অ্যালিবি।

—হ্যাঁ। সেটাই তো ধন্দে ফেলছে। পি এম রিপোর্ট বলছে আড়াইটে নাগাদ মিসেস ঘোষের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু সদানন্দ সে সময় ছিল অপিসের কাজে।

—তাহলে নিশ্চই কোন যমজ সদানন্দ আছে।

—না তা নেই। তবে মলিনা আবার বলছে কেন, তার দাদাবাবু দুপুরে এসেছিল।

—আইদার মলিনা সময়ের গণ্ডগোল করছে অথবা কারো শেখানো কথা বলছে।

—শেখানো কথা ? কার ?

—যে খুনটা করেছে তার।

—তাহলে খুনী লেখাদেবী ?

—না, লেখাদেবী দুপর বারোটা থেকে বিকেল পোনে চারটে পর্যন্ত ঐ বাড়িতেই ছিলেন না।

—অপেনি এত ডেফিনিট হচ্ছেন কী ভাবে ?

—লেখাদেবী তাঁর অ্যালিবি প্রমাণ করেছেন আমার কাছে।

—কী রকম ?

—তাহলে শুনুন। লেখাদেবী কলকাতা এসেছিলেন হলিডে মুডে। কিন্তু এখানে এসে তিনি তাঁর দিদির ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। সদানন্দর প্রতি তাঁর কোন দুর্বলতাই ছিল না। সদানন্দরও না। লেখাদেবীকে হাতের সামনে পেয়ে নিজের বিবাহিত জীবনের করুণ কাহিনী শোনাতেন। এবং সেটা সুশীলা দেবী ঘুমিয়ে পড়লে। ছাদে দাঁড়িয়ে। তারপর একদিন ছাদে ওদের দুজনকে এক সংগে পেয়ে অকথ্য ভাষায় দুজনকেই গালাগাল করেন। লেখা দেবী সেদিনই ঠিক করলেন কলকাতা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবেন। কিংবা দিল্লীতেই ফিরে যাবেন। কিন্তু সদানন্দর কাতর মিনতিতে লেখা দেবী আরও দেড়মাস কলকাতায় থাকার সিদ্ধান্ত নেন।

—হিয়ার ইজ মাই পয়েণ্ট, তালুকদার বাধা দিয়ে বলেন, একটি মেয়ের মধ্যে যদি দুর্বলতা না থাকে, তার ওপর উনি একজন এডুকেটেড মহিলা, তাঁর পক্ষে কী পরপুরুষের কথায় নোংরা ভাষায় গালাগালি খাবার পরও কলকাতায় থেকে যাবার কথা ভাবতে পারেন, না পারা সম্ভব ?

—আপনার এই আর্গুমেণ্ট আমি অস্বীকার করছি না। মেয়েদের মন কখন কী ভাবে কার ওপর ডাইলুটেড হয় আপনার আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। লেখাদেবী আমার কাছে নিজেই স্বীকার করেছেন সদানন্দর করুণ দাম্পত্য জীবনই সদানন্দর প্রতি তার দুর্বলতার জন্ম দেয়। কিন্তু,

—কিন্তু ?

—উভয় উভয়ের প্রতি দুর্বল হলেও, পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের ব্যাপারটা লেখাদেবী দিল্লী ফিরে গিয়েই শেষ করে দিতেন। সেটা উভয়েই স্বীকার করেছেন। লেখাদেবী কখনোই চাননি সুশীলাদেবীর সংসার ভেসে যাক।

—হু। কিন্তু লেখাদেবীর অ্যালিবি কী ?

—দুটোর একটু আগে অফিস থেকে বেরিয়ে সদানন্দ গিয়েছিলেন কোম্পানীর এক পার্টির সঙ্গে কথাবার্তা বলতে। কিছু প্রোডাকসানের মধ্যে সেকেণ্ড গ্রেডেড মাল ঢুকে গিয়েছিল। তাতে সেই পার্টির কিছু লস্ হয়। অর্থাৎ নিজেদের কোম্পানীর গুড উইল বাঁচাতেই সদানন্দর সেখানে যাওরা। আমি নিজে গিয়ে এ তথ্য সংগ্রহ করে এসেছি।

—বেশ তারপর ?

—এটা করতে বেজে যায় বিকেল তিনটে। কিন্তু বিকেল সওয়া তিনটের সময় সদানন্দর সঙ্গে লেখার অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট ছিল।

—কিসের অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট ?

—ওনলি ফর আ শেলটার অব লেখা বসু। হ্যাঁ, ঠিক তাই। সদানন্দর বিশেষ বন্ধু শ্যামলকান্তি বাবু একটি হস্টেলে লেখা দেবীর দেড় মাসের মতো থাকার ব্যবস্থা করেন। হস্টেলটা শ্যামলকান্তি বাবুর বাড়ির দু তিনটে বাড়ির পরেই। ওঁরা দুজনে সাড়ে তিনটের সময় শ্যামলকান্তিবাবুর বাড়ি পেঁছিন। সদানন্দর সঙ্গে গাড়ি ছিল। ওঁরা যে ঐ সময়েই পেঁছিন সেটা স্বীকার করেছেন শ্যামলবাবু এবং তার স্ত্রী ও সদ্য স্কুল থেকে ফেরা ওদের মাত্র সাত বছর বয়েসের মেয়ে টুম্পা। ওই টুকু মেয়ে আমার জেরার কাছে মিথ্যে বলতে পারে না। এরপর ওঁরা হস্টেলে যান। টাকা জমা দেন। রসিদ নেন। পরের দিন থেকে লেখাদেবীর ওখানে চলে যাবার কথা। তারপর লেখাদেবীকে ভবানীপুরের মোড়ে নামিয়ে দেন সদানন্দ। অফিসে ফিরে আসেন চারটে নয়, চারটে দশে। আসার পরই লেখাদেবীর ফোন পান। ডালহাউসী থেকে রাসবিহারী পেঁছে যান সাড়ে চারটে নাগাদ।

—তাহলে ছাতার মাথা দাঁড়ালোটা কী ?

—কিছু মনে করবেন না মিঃ তালুকদার। কোথাও কোন গৃহবধূ খুন হলেই, আমি আপনাদের কাছের লোক হয়েও বলছি, পুলিশ প্রথমেই পাকড়াও করে তার স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ি ননদ দেওরকে। তারপর থানায় নিয়ে গিয়ে উত্তম-মধ্যম। তলিয়ে দেখার ব্যাপারগুলো আসে পড়ে। আপনার কী মনে হয় যে সব গৃহবধূ হত্যা হয়েছে তাদের কারো কোন দোষ ছিল না। গৃহবধূরা কী অন্যায় করতে পারে না ? আমি একজনকে জানি, বুড়ি শাশুড়িকে উঠতে বসতে থেঁতো করে, নব্যযুবতী বধূমাতা। আর তাতে সায় দেয় বধু সোহাগে স্বামীজি। ক্যান ইউ ডিনাই ইট ?

—ঠিক আছে, এটা তর্কের ব্যাপার। আপাতত সদানন্দকে ক্লীয়ার করুন। আপনার মতে সদানন্দ নয়, লেখা নয়, তবে কী মলিনা নাকি তার পিসিমা, নাকি যে কাজের মেয়েটাকে একদিন মিসেস ঘোষ যাতা বলে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন সেই এসে রিভেঞ্জ নিয়ে গেছে ?

নীলের ঠোঁটের কোণে হাসির আভাষ। সে একটা সিগারেট ধরায়। তারপর ঘাড় নীচু করে মাথা দোলাতে দোলাতে বলে, সুশীলাদেবীর ডেড-বডিটা আমি অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছিলাম। প্রথম যেটা চোখে পড়ে, কষের গায়ে তখনও রক্তের হাল্কা দাগ। দ্বিতীয়ত, সারা মুখে প্রচণ্ড যন্ত্রণা পাওয়ায় চিহ্ন। এবং মুখটাও খুব কালচে লাগছিল। কেন ? তার হার্টের প্রবলেম ছিল। ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাকে মরলে মুখে যন্ত্রণার ছাপ থাকতে পারে। কিন্তু এটা ভয়ংকর রকমের কিছু একটা যন্ত্রণার প্রতিফলন। কী হ'তে পারে তাই ভাবছিলাম। হঠাৎ আমার নজরে আসে মৃতার সব আঙুলেই আংটি

আছে, কিন্তু সাধারণত যে আঙুলে লোকে আংটি পড়ে অর্থাৎ অনামিকা ফাঁকা। এবং সেখানে আংটির দাগও রয়ে গেছে। কেউ কী খুলে নিয়েছে মৃত্যুর পর? হতেও পারে। হীরের আংটি বলে কথা। এবং আংটি দেখতে গিয়েই নজরে এলো তিনটে আঙুলে স্পষ্ট কালো দাগ। আচ্ছা তালুকদার, আমার সিগারেটে এখন অনেকটা ছাই জমেছে। তাই না?

—হ্যাঁ ওটা অ্যাসট্রেতে ফেলে দিন।

—না। সেজন্যে জমাই নি। একটা প্রমাণের জন্যে ধরে রেখেছি। আপনার তর্জনী মধ্যমা আর বুড়ো আঙুলটা এগিয়ে দিন।

বিকাশ তাই করে। নীল আলতো করে তিন আঙুলের মিলন ক্ষেত্রে খুব সাবধানে ছাইটা রাখে। তারপর বলে, এবার ঐ ছাই রঙা ছাইটা আঙুলে ঘষুন।

ঘষার পর দেখতে দেখতে আঙুলের চামড়াগুলো এক ধরণের কালচে দাগে পরিণত হল।

—হ্যাঁ, এই তো ঘষলাম। তাতে হ'লটা কী?

—ওটাই হ'ল। জায়গাটা কালো হয়ে গেল। আর মিসেস ঘোষের ঠিক এই তিনটে আঙ্গুলেই ঐ রকম দাগ স্পষ্ট হয়েছিল।

—অনেক সময় মেয়েরা ডুমুর থোড় কাটলেও ঐ রকম দাগ হতে পারে।

—সে খোঁজও নিয়েছি। সেদিন ও বাড়িতে কোন থোড় বা ডুমুর রান্না হয়নি। তাছাড়া সেদিন সুশীলাদেবী রান্না ঘরেই যাননি। শরীর ও মন খারাপ ছিল বলে। রান্না করে মলিনা। মলিনা তা স্বীকার করেছে।

হাল ছেড়ে দিতে দিতে বিকাশ বলে, তাহলে দাগটা কিসের?

—পোড়া ছাইয়ের।

—আবার ছাই পেলেন কোত্থেকে?

—সদানন্দবাবুর টানা ড্রয়ারের মধ্যে থেকে।

—ড্রয়ারের মধ্যে ছাই? কিসের ছাই?

—কোন কিছু কাগজপত্র পুড়িয়ে নষ্ট করে দেওয়ার শেষ চিহ্ন।

—মাথায় কিছু ঢুকছে না।

—লেখাদেবীকে সেদিন আমি আসার সময়ে অনুরোধ করে এসেছিলাম, একটা ডায়েরী উনি কোথাও খুজে পান কিনা? এ কেসে ডায়েরীটা ভেরী এসেনসিয়াল টু ফাইন্ড ইট আউট। আর সেটা সম্ভবত ঐ ড্রয়ারেরই আশে-পাশে কোথাও হবে।

—ডায়েরি পাওয়া গেছে?

—হ্যাঁ, আধ পোড়া একটা ডায়েরী, উনিশশো নব্বই সালের। যার মধ্যে সতেরই অক্টোবর আর বারই আগস্টের পাতা দুটো টেনে ছিঁড়ে নেওয়া

হয়েছিল। ডায়েরীটা ছিল ড্রয়ারওলা আলমারির পেছনে। স্বল্পপরিসরে ঠেসে রাখা হয়েছিল। এবং ত্বরিৎ গতিতে।

—কোথায় সে ডায়েরী? কী আছে তাতে?

—খুনীর জবানবন্দী। স্বীকারোক্তি। কিছু কিছু জায়গা পুড়ে গেছে তবে আসল কথাগুলো উদ্ধার করা গেছে।

—একবার দেখতে পারি?

—অফকোর্স, বলে নীল উঠে গিয়ে পেছনের শেলফ্ থেকে প্লাস্টিকে মোড়া সযত্নায়িত একটি ছোট মাপের ডায়েরী বের করে আনে। তারপর বলে, সদানন্দকে অ্যারেষ্ট করতে বলেছিলাম একটাই কারণে, যাতে করে সদানন্দকে জেলমুক্ত করে আনার ব্যাপারে ডায়েরীর অবদান যে অনেক এবং তার জন্যে লেখার চেষ্টায় যেন কোন ফাঁক না থাকে, সেই জন্যেই। নিজে এবার পড়ুন ডায়েরীটা। আমি বরং আপনার জন্যে চিনি ছাড়া চা করে নিয়ে আসি।

নীল বেরিয়ে যায়। মিনিট পনের পর ফিরে আসে। ততক্ষণে বিকাশের মুখ ঝুলে গেছে। বোকা বোকা অভিব্যক্তি। চোখ ছানাবড়া।

—শেষ?

—এটা কী হ'ল মশাই?

—খুনীকে ধরতে পারলেন?

—পেরেছি। কিন্তু তাকে তো ধরার উপায় নেই।

—হ্যাঁ কারণ এখানে নিহত নিজেই তো খুনী। নিজেই খুন করে সদানন্দ আর লেখাকে সারাজীবনের মতো জেলে পাঠাতে চেয়েছিল। যাতে তারা ইহজীবনে আর কেউ কারো সঙ্গে মিলিত হতে না পারে।

—এ তো ডেঞ্জারস সাইকো পেসেণ্ট। নিজেই নিজের দুধে অ্যাসিড মেশালো। তারপব এমন ভাবে চিঠি লিখল,

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে নীল বলল, দ্যাট লেটার ইজ দ্য মেইন টার্নিং পয়েণ্ট অব দিস গেম।

চিঠিটা আরো একবার পড়লে বুঝতে পারবেন মৃত্যুর আগেই সেটা লেখা হয়েছিল। কারণ নাইট্রিক অ্যাসিড খাবার পর কেউ ওভাবে চিঠি লিখতে পারে না। তার যখন গলা জ্বলছে, বুক জ্বলছে, চোখে অন্ধকার দেখছে, তারপর কী আর হাত চলতে পারে?

—তাই বুঝি আপনি বলেছিলেন, অ্যাবসার্ড।

—ইয়েস স্যার।

* * *

লেখাদেবীর আর দিল্লী ফেরা হয়নি। প্রফেসারি ছেড়ে দিয়েছেন। বাংলাটাও বেশ রপ্ত হয়ে গেছে। সদানন্দকে নিয়ে তাঁর এখন সুখী দাম্পত্য জীবন।

জলছবি

ট্রেজার আইল্যান্ডে হঠাৎ দেখা দুজনের। পৃথা আর অরুণাভ। জংলা প্রিণ্টের একটা সিফন জর্জেট নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল পৃথা। অরুণাভ প্যাণ্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে এলোমেলোভাবে দৃষ্টি ছড়াচ্ছিল শার্ট পিসের ওপর। হঠাৎই, ঠিক একই সময়ে, অরুণাভ পিছন ফেরে আর পৃথা শাড়ির বুক থেকে মুখ তুলে সামনে তাকায়। মাত্র এক লহমার অলস দৃষ্টি দুজনকেই সচকিত করে দেয়। দুজনেই পুনর্বার পরিচিতের দৃষ্টি মেলে দুজনের দিকে তাকায়।

কী অদ্ভুত যোগাযোগ। দীর্ঘ দশ বছর দুজনের কেউই ক্ষণিকের জন্যেও ভাবেনি আবার কোনদিন তাদের দেখা হবে।

মুহূর্তের মধ্যে পৃথার চোখে খেলে যায় এক অনিবার্য হাসি। উচ্ছ্বসিত হয়ে এগিয়ে যায় সে, আরে তুমি?

ম্লান, বিব্রত অরুণাভ ঢোঁক গিলে বলে, তুমি? শাড়ি কিনতে?

—কী করি বলো, বাড়িতে দুপুরবেলা একা একা আর সময় কাটতে চায় না। কিন্তু তুমি?

—এমনি। এটা সেটা দেখে সময় কাটাচ্ছি।

—কেন, অফিস যাওনি?

—অফিস? ঠোঁটের কোণে ম্লান হাসি ফিরিয়ে এনে বলে, নেই। এখন বেকার।

—কেন, তুমি তো ভাল চাকরি করতে, উঁচু পোস্টে।

—সেসব অনেক কথা। ঠিক এখানে দাঁড়িয়ে সব বলা যাবে না।

—তাহলে চলো আমার সঙ্গে। ভয় নেই, আগের মতো হাঁটাব না। সঙ্গে গাড়ি আছে।

অরুণাভ চমকে তাকায় পৃথার দিকে।

—হ্যাঁগো, সবুজ মারুতি। আমার স্বামীর খুব পছন্দের রঙ।

*　　　*　　　*

বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের সাততলার বারান্দায় দাঁড়ালে শহরটাকে বড় অন্যরকম লাগে পৃথার। মাঝে মাঝে ওর মন যখন চঞ্চল হয়ে ওঠে, একটা অস্বাভাবিক ঔদাসীন্য ওকে গ্রাস করে, তখনই ও এসে দাঁড়ায় সাততলার বারান্দায়। গাড়ি, মানুষ, শাহরিক ব্যস্ততা সব যেন মনে হয় কতদূরে।

তার নাগালের বাইরে চলে গেছে। সব চাঞ্চল্য থেকে নিমিষে ও যেন উঠে এসেছে, অনেক, অনেকটা উঁচুতে। এখন রাত দুটো। নির্মাল্য ঘুমিয়ে আছে। ব্যবসায়ী মানুষ। পঞ্চাশ পেরিয়ে যাওয়া মানুষটা এখনও কী অসম্ভব পরিশ্রম করতে পারে। পরিশ্রম আর বুদ্ধির খেলায় মানুষটা আজ মস্ত ব্যবসায়ী।

কিছুতেই ঘুম আসছিল না পৃথার। অনেকক্ষণ এপাশ ওপাশ করে এসে দাঁড়িয়েছে সাততলার বারান্দায়। গভীর রাতের শহরটা এমন করে কোনদিনও দেখা হয়নি। কোন এক জাদুকরের হাতের ছোঁয়ায় নীচের চৌমাথার চেহারাটাই পাল্টে গেছে। কী অসম্ভব নির্জনতা বুকে নিয়ে খাঁ খাঁ করছে শহরটা।

শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল পৃথা। রাতের শহরের মতো ওর মনের শূন্যতায় কখন যেন জলছবির মতো অনির্বচনীয় রোমাঞ্চ দৃশ্য ফুটে উঠেছে। জলরঙের আঁকা ছবির মতো, নরম অথচ গভীর। সামনে রাখলে এলোমেলো রঙ, দূরে গেলেই ফুটে ওঠে বর্ণালী সজীবতা।

—এতো দেরী করে এলে কেন বলো তো? সেই কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি। আর লোকগুলো এত খারাপ, ভাবা যায় না। সবাই যেন চোখ দিয়ে গিলতে চায়।

—স্যরি পৃথা, ঠিক ওঠায় মুখেই বড় সাহেবের তলব। ভীষণ জরুরি চিঠি। কালকের প্রথম ডাকে উত্তর পাঠাতেই হবে, প্লিজ।

—ওহ, উনি না থাকলে যেন কোম্পানি উঠে যাবে।

—না না, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়, আসলে আমার পোস্টটাই।

—ঠিক আছে, এই কম্পানি ছেড়ে তুমি তোমার কোম্পানি নিয়েই থাকো. ওখানে আয়, এখানে শুধু অপব্যয়।

—ঝগড়া করবে, না যাবে? দেখছো আশেপাশে কত লোক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছো।

—দেখুক, এতক্ষণ আমায় দেখছিল, এখন তোমায় দেখছে।

হেসে ওঠে অরুণাভ, আমায় দেখে দেখুক, কিন্তু শত সহস্রের দ্রষ্টব্য হও তুমি, এটা মোটেই আমার কাম্য নয়। আমি খুব হিংসুটে, নাও চলো।

জলরঙে আঁকা ছবিটা এখন কত দূরে। কিন্তু কী আশ্চর্য পরিষ্কার। এলোমেলো আঁচড় এখন পরিপূর্ণতায়। হাঁটুতে থুতনি ঠেকিয়ে বসে ছিল সবুজ ঘাসের ওপর। ডান হাত দিয়ে নির্মমভাবে ছিঁড়ে চলছিল গোছা গোছা কচি ঘাস। ঠিক সামনে বসে একের পর এক সিগারেট খেয়ে চলেছে অরুণাভ।

—কী ভাবছো? ছেঁড়া ঘাস ছড়াতে ছড়াতে প্রশ্ন করে পৃথা।

—আর ক'টা বছর অপেক্ষা করা যায় না ?

—আরও কটা বছর একটা ছেলের কাছে হয়তো কিছু নয় কিন্তু একটা মেয়ের কাছে, তাছাড়া তুমি তো জানোই আমার পরে আরও তিন বোন। বাবার রিটায়ারমেণ্টের আর এক বছর বাকি।

—আমি সব বুঝি পৃথা, কিন্তু, জানোই তো আমি বাবা মায়ের একমাত্র ছেলে, তাই,

—কী তাই ?

—তোমার আমার কথাটা পাড়তেই পারছি না। আসলে ওঁদের প্রত্যাশা বেশি, শুনলে শক্‌ড্‌ হবেন।

—কিন্তু একদিন তো বলতেই হবে, নাকি তুমি এখন পেছিয়ে যেতে চাইছো ?

—কী যে বলো! ঠিক আছে, অন্তত ক'টা দিন সময় দেবে তো ?

কথা রেখেছিল অরুণাভ। ঠিক এক সপ্তাহের পর একদিন হুই হুই করে পৃথার বাড়ি এসে হাজির। সেই প্রথম আসা। একান্তে পৃথাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলেছিল, সব ঠিক হয়ে গেছে। বলো কবে বিয়ে করতে চাও ?

উচ্ছ্বসিত পৃথা বলেছিল; সব ঠিক, মানে তোমার বাবা মা ?

—একমাত্র ছেলের কথা কি আর 'না' বলে ফেলে দিতে পারেন ? তবে আমার বাবা আসবেন তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলতে, মানে ফাইনাল ডেট ঠিক করতে।

শেষ পর্যন্ত বিয়ের দিনক্ষণ সব ঠিক হয়ে গেল। চার মেয়ের কেরানি বাবা, তাঁর সাধ্য সামর্থ অনুযায়ী কেনাকাটা শুরু করে দিলেন। কিন্তু জমানো টাকা আর কিছু প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড থেকে ধার করা টাকায় পৃথার বাড়ি যখন ধীরে ধীরে উৎসবের চেহারা নিচ্ছে, পৃথা মনে মনে ভাবী জীবনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে, নেমন্তন্ন পর্ব যখন সারা, যখন মাত্র আর দুদিন বাকি বিয়ের, ঠিক তখনই ভূমিকম্পের মতো পৃথার পৃথিবী দুলে গেল। চোখের সামনে সে দেখল তাদের ছোট্ট গরিবের ঘরটা তাসের ঘরের মতো মাটিতে ছড়িয়ে গেছে এলোমেলো।

বিয়ের ঠিক দুদিন আগে অরুণাভর বাবা চিঠি পাঠিয়েছিলেন। সে চিঠি আজও সযত্নে রেখে দিয়েছে পৃথা। চিঠির সারমর্ম, ছেলের পছন্দ মতো বিয়েতে তাঁর অমত নেই, কিন্তু তাঁর ছেলে এক বিরাট কোম্পানীর মস্ত অফিসার। তার সামাজিক সার্কেল বিরাট। স্বাভাবিক কারণে যেমন তেমন ভাবে তো বিয়ে সম্ভব নয়। কিছু না হলেও আমন্ত্রিতের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে যাবে। দাবিদাওয়া হিসাবে তাঁরা বিশেষ কিছু চাননি।

কিন্তু অতিথি আপ্যায়নের খরচটি তিনি কন্যাপক্ষের কাছে নগদ চান। এবং সেই নগদের পরিমাণ ন্যূনপক্ষে চল্লিশ হাজার। বেশি হলে তো ভালই হয়। জলরঙের আঁকা ছবিটা কেমন যেন ঝাপসা হয়ে ওঠে। বোধহয় পৃথার চোখের সাগরে সেই ঝাপসা ছবিতেই সে দেখতে পায় তার বাবার মৃত্যু-দৃশ্য। না, সম্ভব ছিল না মাত্র দুদিনের মধ্যে অত টাকা জোগাড় করা সামান্য এক কেরানির পক্ষে। অথচ সব আয়োজন সারা। নিমন্ত্রণ পর্বও শেষ। আত্মীয়রা কেউ কেউ এসেও গেছেন। টাকা না দিতে পারলে বিয়ে হবে না এমন কথাও লেখা ছিল সেই চিঠিতে। সাতান্ন বছরের প্রৌঢ় কেরানি এ ধকল সইতে পারেননি। বাবার মৃত্যুর আগে পৃথা শেষ চেষ্টা হিসেবে অরুণাভর সঙ্গে দেখা করেছিল। কিন্তু অরুণাভ তখন একান্তই পিতৃভক্ত। সে সবিনয়ে জানিয়েছিল, বাবা কিন্তু বেশি কিছু দাবি করেননি তোমাদের কাছে! এই সামান্যটুকু না দিলে যে মান থাকে না তার ভাবী শ্বশুরবাড়ির।

তারপর উপন্যাসের থেকেও চমকপ্রদ ভাবে কেটে গেছে দশটা বছর। চলচ্চিত্রের মতে দ্রুতগতিতে ঘটনা ছড়িয়ে গেছে জীবনের সাদা পর্দা ধরে। বাবার মৃত্যুর পর মায়ের মৃত্যু। অভাবনীয়ভাবে দেখা নির্মাল্যর সঙ্গে। বিপত্নীক ব্যবসায়ী নির্মাল্য। বয়েসের ব্যবধান প্রায় বাইশ বছরের। নির্মাল্যর বড় পছন্দ হয়েছিল তার কাছে চাকরির উমেদারিতে আসা পৃথাকে। চাকরির বদলে মানুষটা শুনিয়েছিল তার জীবনের দুর্বলতার দিকটি। বলেছিল সে বড় একা। পৃথা তার জীবনের এলে নতুন উদ্যমে আবার সে এগিরে যেতে পারে। কোন কিছু ভাবার অবসর ছিল না পৃথার। নির্মাল্যকেই সে বিয়ে করে। নির্মাল্যর প্রচেষ্টাতেই তার পরবর্তী তিন বোন সুপাত্রস্থ হয়। তারা আজ সুখী। কিন্তু সে? তার জীবনে প্রৌঢ় হলেও একজন স্বামী আছে, আছে ইচ্ছে মতো খরচ করার টাকা, আছে একটা মানুষকে খুশি মতো চালিত করার নেশা। হয়তো কিছু ভালবাসা। কিন্তু?

সেই কিন্তুটাই আজ দশ বছর পর তাকে এলোমেলো করে দিল। তার দশ বছরের ভাবনাগুলো সহসাই এক অন্যতর অনুভূতিতে সজাগ হয়ে উঠল। তবে কী সে আজও অরুণাভকে ভুলতে পারেনি? ভুলতে পারেনি কী অন্য এক বিশেষ কারণে?

* * *

—এ তোমার কী হাল হয়েছে অরুণ? সেই ঝকঝকে ছেলেটাকে তুমি কোথায় রেখে এসেছো?

অরুণাভর ঠোঁট টেপা ম্লান হাসিটা পৃথার বরাবরই ভাল লাগত। আজও নতুন করে ভাল লাগল। অরুণাভ ম্লান হেসে কিছু বলতে চেয়েছিল। তার

আগেই পৃথা বলে ওঠে, ফের তুমি ওইভাবে হাসছো ? জানো না, তোমার ওই ম্লান চাপা হাসি দেখলে আমার সর্বাঙ্গ শিরশির করে ওঠে ?

—মনে আছে এখনও পুরনো সব কিছু ?

—সব।

সামান্য সময় চুপ করে থেকে অরুণাভ বলে, আমায় তুমি ক্ষমা করতে পারো না পৃথা ?

হো হো করে হেসে ওঠে পৃথা, ওমা তুমি এখনও সেসব মনে রেখেছো ?

—না, মানে, সেদিন বাবার কথা মানতে গিয়ে জীবনে একটা মস্ত ভুল করে ফেললাম।

অরুণাভকে বিবশ করে প্রায় ফিসফিস করে বলে ওঠে, ইচ্ছে হলে ভুলটা এখনও শোধরানো যায়।

চমকে ওঠে অরুণাভ। আবেগতাড়িত কণ্ঠে ডাকে, পৃথা।

—তোমার স্বভাবে এখনও সেই পুতুল পুতুল ভাব, যার নিজের ইচ্ছে বলে কিছু নেই। সেদিন চলেছিলে বাবার তালে তাল দিয়ে আর আজ, বউ বকবে ?

আবার সেই ম্লান হাসি, বউ ? ও রত্নটি বোধহয় এ জীবনে আর এল না।

—চল্লিশ হাজারি বায়না বুঝি এখনও ছাড়তে পারোনি ?

—আর কেন কষ্ট দিচ্ছো, বললাম না বল ভুল হয়ে গেছে।

—চাকরি নেই বলে বুঝি বাবুর এই হাল ? উস্কোখুস্কো চুল, ময়লা শার্ট প্যান্ট। কী হয়েছিল ?

—চুরির অভিযোগ। সবাই আমার বিপক্ষে চলে গেল। আসলে জেলাসি।

—এখন কী করছ ?

—কিছু না। জমানো টাকা শেষ হতে চলেছে।

* * *

পার্ক স্ট্রিটের একটা বড় রেস্তোরাঁয় বসে কথা হচ্ছিল। সামনে দেদার খাবার। পৃথার আমন্ত্রণেই এই অভিসার। অরুণাভর কথা শুনে সে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে খেয়ে গেল। অরুণাভও খাচ্ছিল। বহুদিন এত ভালভাল খাবার তার খাওয়া হয়নি। একসময় খাওয়া শেষ করে পৃথা বলল, এই মুহূর্তে তোমার খুব টাকার দরকার তাই না অরুণ ?

—সাধু সন্ন্যাসী ছাড়া কোন পুরুষের টাকার দরকার হয় না বলো ? দরকার, খুব দরকার।

—আমি যদি তোমাকে থোক কিছু রোজগারের রাস্তা করে দিই ?

—বামনকে চাঁদের স্বপ্ন দেখাচ্ছ ?

—না, বামনের হাতে চাঁদির ঝাঁপি তুলে দিতে চাইছি।

—কী রকম?

—ইদানীং আমারও বেশ কিছু টাকার দরকার। সুযোগ সুবিধা তৈরি করে দেবার দায়িত্ব আমার। প্ল্যানও আমার। কিন্তু করতে হবে তোমায়। বদলে পাবে পাঁচ হাজার টাকা, রাজি?

—আলাদিনের গল্প শোনাচ্ছো। বেশ গল্পটাই বলো।

—চুরির অপরাধে তোমার চাকরি নেই। চুরি তুমি করেছিলে কিনা তা তুমিই জানো। এবারও একটা চুরি করতে হবে। সেবার ধরা পড়েছিলে, এবার পড়বে না।

খুব তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে পৃথার মুখের দিকে তাকিয়ে অরুণাভ বলে, তোমার গল্পের কাঠামোটা আমি ঠিক ধরতে পারছি না।

—গল্প না। কয়েকটা সত্যি কথা বলছি। তোমার জন্যেই আজ আমাকে একটা বুড়ো স্বামী নিয়ে ঘর করতে হচ্ছে। লোকটাকে নিয়ে আমি পুতুল খেলা খেলি। আমার যেকোন ইচ্ছেই সে পূরণ করে। কিন্তু একটা মেয়ের জীবনে সেটাই সব নয়। আমি পালাতে চাই।

—কোথায়?

—যেখানে খুশি। কিন্তু এই দশ বছরে আমার স্বভাবটা অনেক পাল্টে গেছে। এটাও জেনেও গেছি টাকা ছাড়া বাঁচা যায় না। ও বুড়োটার হাত থেকে বাঁচতে গেলে আমায় অনেক দূরে কোথাও চলে যেতে হবে। বিন্তু খালি হাতে না

—তুমি কি তোমার স্বামীর,

—হ্যাঁ। চাইলে লোকটা টাকা দেবে, কিন্তু সেটা কত? হাজার, দু'হাজার, পাঁচ হাজার। তার বেশি হলেই কারণ জিগ্যেস করবে। কিন্তু আমার দরকার অনেক বেশি। তোমায় একটা অভিনয় করতে হবে, ডাকাতির, পারবে না?

—ডাকাতি?

—দেখো অরুণ, তুমি না বললেও আমি জানি চুরি ছ্যাঁচড়ামি তুমি জীবনে অনেক করেছো। ঘুষও খেয়েছো প্রচুর। এবার না হয় ডাকাতির অভিনয় করবে। আর, এ তো সহজ ডাকাতি। বুড়ো বাড়ি থাকবে না। ফ্ল্যাটের দরজা খোলাই থাকবে। একজন রাধুনি একজন চাকর। দুটোকেই বাইরে পাঠিযে দোব। তুমি সটান ঢুকে যাবে। আমার হাত পা মুখ বেঁধে চেয়ারের সঙ্গে আটকে দেবে। তারপর সিন্দুক খুলে, এর থেকে সহজ ডাকাতি আর হয় না। সিন্দুকে অবশ্য থাকবে পাঁচ হাজার। তোমার জন্যে। বাকিটা আমি আগেই সরিয়ে নোব। এর পরের অভিনয়টা আমার। রাজি?

রাজি হতে অরুণাভ সময় নিল একমিনিট।

বেশ কাটছিল যুগল প্রণয়ী প্রণয়িনীর। বিশেষ করে অরুণাভর। সে আবার টাকার মুখ দেখছে। আবার ফিরেও পেয়েছে পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনার মতো পৃথাকে। অরুণাভ বেশ বুঝতে পারে পৃথা আবার নতুন করে জড়িয়ে পড়ছে তার সঙ্গে। প্রথম প্রথম তার ব্যবহারটা ছিল একটু দূরত্ব বজায় রাখা। কিন্তু এখন কথায় বার্তায় আকারে ইঙ্গিতে জানিয়ে দেয় আজও সে তাকে ভুলতে পারেনি। প্রথম দিন অবশ্য পার্ক স্ট্রিটে চীনে রেস্তোরাঁয় বসে বলেছিল ভুলটা এখনও শোধরানো যেতে পারে। কিন্তু তখন কোথায় যেন একটা দূরত্ব ছিল। এখন সেটা কেটে গেছে। কিন্তু এ মেয়েকে নিয়ে তো চলবে না। কোন মেয়েলি বন্ধনের মধ্যেই সে যেতে রাজি নয়। অরুণাভ এক ফাঁদে দুটো শীকার ধরতে চায়। পৃথাকে দিয়ে একটা বড় দাঁও মেরে ওকে নিয়ে কিছুদিনের জন্যে কোথাও উধাও হয়ে যেতে হবে। তারপর একদিন সুযোগ বুঝে,

—কী ভাবছো অরুণ ?

—শুনলে তোমার রাগ হতে পারে।

—আমার রাগি রাগি মুখটা দেখতে তো তোমার ভাল লাগে, একথা অনেকবার বলেছো। সেই ভাল লাগাটাই না হয় মিটিয়ে নাও।

—এভাবে পাঁচ দশে তুমি আর কতদিন বুড়োকে ধাপ্পা দিতে পারবে ?

—বড় কিছুর কথা ভাবছো ? আমি কিন্তু ভেবে ফেলেছি।

—তাই ?

—হ্যাঁ মিস্টার, আর এটাই হবে আমাদের শেষ পরিকল্পনা।

—তার মানে, এবার তুমি,

—পালাব। আর তোমার হাত ধরে। পারবে না এই হাতদুটোকে বাকি জীবনের জন্যে ধরে রাখতে ?

—আমি তো হাত ধুয়েই বসে আছি। অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণাকে হাত ধরে ঘরে নিয়ে যাবার জন্যে।

—তাহলে শোনো, একশো ভরি সোনার গয়না আছে আমার। আছে বেশ কিছু দামি পাথরের সেট। অবশ্য সেগুলো লকারেই আছে। আসছে সপ্তাহে একটা পার্টি অ্যাটেন্ড করতে যেতে হবে আমার স্বামীর সঙ্গে। সমস্ত গয়না আমি তুলে এনে বাড়িতে রাখব। অবশ্য এক্ষেত্রে বুড়ো নির্মাল্যর আর্থিক ক্ষতি কিছু হবে না কারণ সব গয়নাই ইনসিওর করা আছে। গয়নার বাক্স চুরি গেছে এমনটি যদি প্রমাণিত হয় বীমা কোম্পানি সেটা পুষিয়ে দেবে। তারপর,

—কিন্তু, অরুণাভ একটু দ্বন্দ্বে পড়ে। বলে, ব্যাপারটা কিন্তু খুবই রিস্কি হয়ে যাবে। এই নিয়ে তিনবার যদি একই কায়দায় বাড়ি থেকে চুরি

হতে থাকে, বীমা কোম্পানীর কথা ছেড়েই দাও, তোমার স্বামী কী কিছু সন্দেহ করবেন না ?

— করলে করবে। তখন আমাদের পাচ্ছে কোথায় ?

— কিন্তু ডাকাতির সঙ্গে সঙ্গে তুমি উধাও হয়ে গেলে পুলিশ তোমার পেছনেই ফেউ লাগাবে। আর তুমি ধরা পড়লে আমিও ফেঁসে যাব।

—আমি জানি, তুমি বরাবরই নিজের কথা ভাবতে বেশী ভালবাসো। কিন্তু রিস্ক না নিলে জীবনে বড় কিছু করা যায় না। ঠিক আছে, অতই যদি তোমার ভয়, তাহলে গয়নার বাক্সের ডাকাতির অভিনয়টা করে, নিজের ভাগের টাকা নিয়ে চলে যেও যেখানে খুশি। এরপর আর আমাদের দেখা হবে না। আমি কী করব সেটা তখন ভেবে নেব, তোমাকে আর বিরক্ত করব না।

অরুণাভ প্রমাদ গোণে। একটা বেফাঁস বলে ফেলে রাজত্ব আর রাজকন্যা দুটোই হাতছাড়া হবার দাখিল। নিমেষে নিজের ভোল পাল্টায়, বেশ ছিলুম পৃথা। কিন্তু দশ বছর পর হঠাৎ এসে আমার সব কিছু ওলটপালট করে দিলে কেন ? এখন তোমায় ছাড়া বাঁচার কথা ভাবতেই পারি না।

—আমাকে পেতে গেলে জীবনে হয়তো শেষ বারের জন্যেও তোমাকে একটা বড় রিস্ক নিতেই হবে। একবার পারোনি, হারিয়েছিলে। সেটা টাকার জন্যেই। এবার নতুন করে সুযোগ এসেছে। আমার সঙ্গে পাবে দেদার টাকা। ভেবে দেখো।

অরুণাভ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। আর একটু হলেই সব ভেস্তে যাচ্ছিল। নাহ্, সুযোগ সব সময় আসে না। দৈবপ্রেরিত হয়ে পৃথা আবার তার জীবনে এসেছে, দেদার টাকা নিয়ে। পৃথা নয়, তার অনেক, অনেক টাকার দরকার।

—ভাবা শেষ হল ? তাগিদ দেয় পৃথা।

—হয়েছে। তোমাকে আমি ফের হারাতে পারব না, বলো কী করতে হবে ?

সব কিছু বুঝিয়ে দেয় পৃথা। তারপর বলে, এবার কিন্তু চুরির সময় আমি বাড়ি থাকব না। বারবার তিনবার গৃহকর্ত্রীর উপস্থিতিতে ডাকাতি হয়ে যাবে, সেটা কেউই সুনজরে দেখবে না। কোন সন্দেহের অবকাশ আমি রাখতে চাই না। আমি সেদিন আমার স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে কোথাও বেরিয়ে যাব।

* * *

স্বয়ংক্রিয় লিফট্। ওঠানামার আর কোন যাত্রী ছিল না। লিফ্টে উঠে সাত নম্বরে পৌঁছে প্রবেশ করে অরুণাভ। লম্বা করিডোর ফাকাই পড়ে আছে, নাহ্ তাকে কেউ দেখেনি। এর আগেও দুবার সে এসেছে। সে দুবার অবশ্য

ফ্ল্যাটে পৃথা ছিল। কিন্তু এবার সে একা। মনে মনে একবার সে ইষ্টনাম জপ করে নিল। কোন রকমে এইবার উতরে গেলে এই শহরটাই ছেড়ে চলে যাবে পৃথাকে নিয়ে, তারপর,

দ্রুতগতিতে সে এগিয়ে গিয়ে থামে দশ নম্বর ফ্ল্যাটে, বেল বাজায়। দরজা খুলে দাঁড়ায় মাঝবয়েসি একটি মেয়ে।

—কাকে চাই ?

—নির্মাল্যবাবু আছেন ?

—না নেই।

—ওঁর স্ত্রী ?

—না, দুজনেই বেরিয়েছেন।

—কেন মিথ্যে কথা বলছো, এক্ষুনি আমায় ফোন করেছিলেন নির্মাল্য-বাবু।

—মিছে কথা। তেনারা দুজনেই বিকেলে বেরিয়ে গেছেন।

—না বেরোয়নি, বলেই সজোরে এক ধাক্কা দিয়ে অরুণাভ দরজা ঠেলে ফ্ল্যাটের মধ্যে ঢুকে পড়ে। হতভম্ব মেয়েটি দেখে অরুণাভর হাতে চকচকে একটি পিস্তল। মেয়েটি টু শব্দ করার আগেই প্রচণ্ড এক ঘুষি মারে মেয়েটির নাকে। মেয়েটি জ্ঞান হারায়।

দরজা বন্ধ করে অরুণাভ এদিক ওদিক তাকায়। না, আর কেউ নেই। এই বিশাল মেজোনাইন ফ্লাটে ওরা স্বামী স্ত্রী ছাড়া দুজন কাজের লোক থাকে। পৃথা বলেছিল চাকরটাকে ও ছুটি দেবে ইভনিং শোয়ে সিনেমা দেখার জন্যে। মেয়েটা থাকবে একা। পৃথা কথা রেখেছে। আর কেউ নেই। সে ধীর পায়ে এগিয়ে যায় ওপরের নির্দিষ্ট ঘরে। পিস্তলটা পকেটে রেখে সে টর্চ জ্বালায়। আলো জ্বালাতে মানা করেছিল পৃথা। দরকার নেই আলোর। নিভিয়ে দেয়। সে জানে ইচ্ছাকৃতভাবে ফেলে যাওয়া চাবির গোছা এখন কোথায়। নির্দ্দিষ্ট স্থান থেকে চাবিটা নিয়ে সিন্দুক খুলে ফেলে। গয়নার বাক্স যথাস্থানেই আছে। বাক্সটা নিয়ে সাইড ব্যাগে ভরে নেয়। আর একটি ছোট্ট কাজ বাকি। ডাকাতির ঘটনা প্রমাণ করার জন্যে ঘরটাকে একটু লণ্ডভণ্ড করার দরকার। এলোপাথাড়ি সব জিনিসপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়। বইয়ের আলমারির কাচ ভাঙে। মেঝেয় কার্পেট পাতা। তাই আওয়াজ তেমন ওঠে না। বইগুলো এলোমেলো ছড়িয়ে দেয় সারা ঘরে। ফুলদানিটা ছুঁড়ে ফেলে অন্যদিকে। সমস্ত ঘরটাকে দ্রুত হাতে তছনছ করতে সে সময় নেয় মাত্র পাঁচ মিনিট। নাহ্ আর থাকার দরকার নেই। এতেই প্রমাণ হয়ে যাবে ডাকাতির ঘটনা। সিন্দুকটা খোলা উচিত। আরও একবার সিন্দুকের মধ্যে আলো ফেলে। কিছু টাকার বাণ্ডিল পায়। সেগুলোও ব্যাগে

ভরে নিয়ে ঠিক যে মুহূর্তে সে ঘর থেকে বেরুতে যাবে, নিমেষে সারা ফ্ল্যাটের আলো জ্বলে ওঠে। অবাক হতচকিত এবং বিহ্বল দৃষ্টিতে সে দেখে তাকে ঘিরে ফেলেছে প্রায় জনা ছয়েক পুলিশ কনস্টেবল। এবং হাতে উদ্যত রিভলবার স্বয়ং পুলিশ অফিসার। কয়েক সেকেণ্ডের চিন্তায় সে ভাবতে চাইল, এরা এতক্ষণ কোথায় ছিল?

অফিসার এগিয়ে গিয়ে অরুণাভর কাঁধের ব্যাগটা তুলে নেন। পকেট থেকে পিস্তলটাও বারকরে একবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বলেন, এই খেলনা পিস্তল নিয়ে ডাকাতি করতে এসেছো বাবা।

অরুণাভর কিছু করার ছিল না বলারও কিছু ছিল না।

অফিসার এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তোলেন। ডায়াল করেন। অরুণাভ শুনতে পেল অফিসার ফোনে বলছেন, মিসেস পৃথা সেন, আপনার অনুমান ঠিক, চোরটা হাতে নাতে ধরা পড়েছে। আপনার হাজব্যাণ্ডকে নিয়ে থানায় চলে আসুন, আমার অনুমান গয়নাগাটি সব ঠিক আছে, তবু একবার দেখে নেবেন।

* * *

সবুজ রঙ মারুতিতে ফিরছিলেন নির্মাল্য আর পৃথা সেন। নির্মাল্যর মুখ ভাবলেশহীন। চুরোট খাওয়া ওর নেশা। আপন মনেই টান দিয়ে চলেছেন। অন্যমনস্ক পৃথা নির্মাল্যর কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে আসে। বলে, তোমার কিছু টাকা ক্ষতি করে দিলুম।

নির্মাল্য মৃদু হাসেন।

পৃথা স্বামীর হাতে হাত রেখে হয়তো সাহস ফিরে পেতে চায়, কাজটা কী খুব অন্যায় করলুম?

এবারও নির্মাল্য কিছু না বলে মৃদু হেসে স্ত্রীর অসহায় হাতটি নিজের বিশাল মুঠোয় এনে আশ্বাসের স্বল্প চাপ দেন।

পৃথা বলে, আমি যে কিছুতেই ভুলতে পারি না, ওর জন্যেই আমার বাবা,

আর বলতে পারে না। গাড়ির জানলার বাইরে মুখ রাখে পৃথা। তার চোখ তখন ছলছল। জলরঙা এই ছবিটা বড় অস্পষ্ট। সে বুঝতে পারে না এই নোনাজল কার জন্যে?

ত্রিভুজে রক্তের দাগ

কলিং বেলের আওয়াজ শুনে দীপু বলল, গুরু, এ নিশ্চই তোমার কোন ক্লায়েন্ট।

ঘোড়ার আড়াই চালে দীপুর মন্ত্রী পাকড়াও করে নীল বলল, কী করে বুঝলি ?

মন্ত্রী সরিয়ে নিতে নিতে দীপু বলল, দেখতে দেখতে অনেক দিন ধরে তোমার চেলা হয়ে আমার কিছুটা নলেজ তো বেড়েছে। তোমার চেনা-শুনো কেউ হলে, ধর পুলিশ অফিসার বিকাশ তালুকদার, কী তোমার সাহিত্যিক বন্ধু অজেয় দা, সটান সিঁড়ি বেয়ে ওপরে চলে আসতো। কিন্তু সিঁড়িতে কার পদশব্দ শুনছ ?

—নেকস্ট্ চাল ভাবতে ভাবতে নীল বলল, কেন দীনুর।

—ইয়েস দীনুদা। সে এবার এসে বলবে,

দীপুর কথা শেষ হবার আগেই দীনুর প্রবেশ। তার চিরকেলে 'যেন'র মুদ্রা দোষ ব্যবহার করে বললো, দাদাবাবু, আপনাকে যেন কে একজন ভদ্দর লোক ডাকছেন। সদাগর মুখুজ্জি যেন তার নাম। তিনি বললেন তিনি যেন আপনার অনেক দিনের যেন পরিচিত। তা এখন কী যেন তাকে বলব ?

—কিছু বলতে হবে না। নীচের ঘরে বসা।

দীনু যে আজ্ঞে বলে চলে গেল।

—ব্যাস্ দাবার দফা গয়া।

—গয়া কাশী জানি না। আর দুটো চালেই তুই মাৎ। ঘুঁটি সাজানো থাক। ঠিক দুটো চালে তোকে মাৎ করবো।

—সিওর ?

—সিওর। বসে বসে ভাব ঠিক কোন্ দুটো চাল দিলে মাত্ হয়ে যাবি। আমি সাগরদার সঙ্গে কথা বলে আসি।

—সাগরদা ? মালকে তুমি চেনো নাকি ?

নীল ধমকে ওঠে, রকের ভাষাটা আজও ছাড়তে পারলি না। আমি যাকে দাদা বলে ডাকছি নিশ্চই সে তোর মাল হবে না ?

—স্যরি গুরু। তুমি লক্ষ্মীর ধ্যানে বসো গিয়ে। আমি ততক্ষণ তোমার ম্যাও সামলাই।

ঘরে ঢুকেই নীল দেখল সাগর মুখার্জি মাথা নীচু করে বসে আছেন।

—কী খবর সাগরদা। আপনি, এ রকম মনমরা হয়ে, আমার কাছে? এনিথিং সিরিয়াস?

সাগর মুখার্জি মুখ তুলে তাকালেন। বছর পঞ্চাশ-বাহান্নর এক সৌম্য দর্শণ ভদ্রলোক। মুখখানি ভাঁরী সুন্দর। চোখে দামী বিলিতি শেল ফ্রেমের চশমা। গায়ে দামী খয়ের রং সাফারি স্যুট। পায়ে ব্রাউন সোয়েডের শ্যু। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। দামী সিগারেটের গন্ধে ঘরটি ভরে উঠেছে।

—বড় বিপদে পড়ে আমি তোমার কাছে এসেছি ভাই।

—তা দাদার বিপদ হলে ভাইতো পাশে দাঁড়াবেই। বলুন আপনার বিপদটা কী?

—হ্যাঁ বলব বলেই তো আসছি।

নীল ওঁর সামনের সোফায় গিয়ে বসে। এখন বর্ষাকাল। বাইরে টিপটিপ করে বৃষ্টিও পড়ছে।

—আপনি কী গাড়ি নিয়ে এসেছেন সাগরদা?

—হ্যাঁ ভাই।

-সেই জন্যেই একদম টিপটপ্। কেবল মুখেয় মধ্যে দুঃশ্চিন্তা। আমার হাতে এখন অনেক সময়। আপনি মন খুলে আপনার প্রবলেমটা কী তাই বলুন।

সাগর মুখার্জি একজন নামকরা চাটার্ড অ্যাকাউণ্ট্যাট। নিজস্ব অডিট ফার্মও আছে। ধনী লোকের একটা আলাদা গাম্ভীর্য থাকে। কিন্তু সে গাম্ভীর্য এখন আর নেই। তিনি খুব বিচলিত কণ্ঠে বললেন, তোমার ভাইপো মানে আমার একমাত্র ছেলে চয়নকে আজ তিনদিন ধরে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তোমার বৌদি তো নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। আমি এখন কী করব নীল?

—সাগরদা আপনি এ শহরের একজন নামকরা মানুষ। অনেক সময়ে আমাকেই কত পরামর্শ দিয়েছেন। এই সিচ্যুয়েশনে কী আপনার ভেঙ্গে পড়া সাজে?

—নিজের একমাত্র সন্তানকে খুঁজে পাওয়া না গেলে আভিজাত্যের সব খোলস ভেঙ্গে যায়। কমনসেন্সটাও তখন কাজ করে না। থাকে কেবল নিরুদ্দিষ্ট সন্তানের জন্যে হা-হুতাশের ছটফটানি।

—সাগরদা আমি আপনার মানসিক অবস্থাটা বুঝতে পারছি। এবার বলুন তো পাওয়া যাচ্ছে না অর্থে আপনি কোথায় কোথায় খোঁজ করছেন?

—সম্ভাব্য সব জায়গায়। কলকাতায় যারা আমার আত্মীয়স্বজন আছে তাদের সবার সঙ্গেই যোগাযোগ করেছি।

—নিশ্চই পুলিশে ডায়েরী করেছেন ?

—সে তো পরের দিন সকালেই। মানে কাল আর্লি মর্নিং-এই।

—চয়নের এখন বয়েস কত ?

—জাস্ট একুশ।

—কী পড়ছিল ?

—বি, এস, সি।

—রেজাল্টে কোন গণ্ডগোল হয়েছে ?

—পরীক্ষার ? না তো। ও বরাবরই পড়াশুনোয় খুব ভাল।

—এনি লাভ অ্যাফেয়ার্স ?

—সেটা তো আমি ঠিক বলতে পারব না। জানলে হয়তো ওর মা জানতে পারে।

—তার মানে মায়ের সঙ্গে রিলেশান খুব ইনটিমেট।

—বলতে পারেন। চয়ন আমাদের একমাত্র সন্তান। ন্যাচার‍্যালি মায়ের সঙ্গে ক্লোজ রিলেশন তো থাকবেই।

—ঠিক আছে আমি বৌদির সঙ্গে কথা বলে নোব। এর আগে কী এ ধরণের কোন ঘটনা ঘটেছিল ? আই মীন্‌ দু একদিনের জন্যে কোথাও গিয়ে থাকা ?

—সে তো মাঝে মাঝেই হয়। কখনও মাসীর বাড়ি। কখনো মামার বাড়ি। কিন্তু না বলে কোন দিনও একটা রাতও বাইরে থাকে নি। তাছাড়া ওর বয়েসটা তো বাইরে থাকার বয়েস নয়। আমরা সেটা পছন্দও করি না।

—রাইট, আচ্ছা সাগরদা, চয়নের স্বভাব, আই মীন, মানুষের সঙ্গে মেলামেশার ধরণ কেমন ছিল ? অনেকে খুব রাফ অ্যাণ্ড টাফ টাইপ হয়। অনেকে খুব ইনট্রোভার্ট।

—ইনট্রোভার্ট সে কোনদিনও নয়। বরং খুব উচ্ছাসপ্রিয়। আমুদে। ঝট্‌ করে যে কোন মানুষকেই আপন করে নিতে পারত। সেটা ওর গানের জন্যেই।

—গান ? ও কী গান টান করতো ?

—করতো, এ ব্যাপারে কলেজে ওর খাতির আছে।

—পরশু কখন থেকে ও বাড়ি ফেরেনি ?

—তুমি তো জানো নানান কেস নিয়ে আমাকে ভীষণ ব্যস্ত থাকতে হয়। তাই ছেলেটার গতিবিধি ইদানীং আমি ঠিক মতো রাখতে পারতাম না। জানি ওর মা আছে। আমার চিন্তার কোন কারণ নেই। তখন প্রায় রাত নটা হবে। মণি এসে বলল চয়ন তখনও ফেরেনি।

—বেরিয়েছিল কখন ?

—মনি তো বলছে সকাল দশটা নাগাদ।

—সাধারণত বাড়ি ফেরে কখন ?

—এটা আমার থেকে মনিই ভাল বলতে পারবে।

—ওক্কে সাগরদা, আপনি বাড়ি যান। আমাকে বৌদির সঙ্গেই কথা বলতে হবে। আমি আজ যে কোন সময়েই আপনার বাড়ি যেতে পারি। আপনি বাড়ি থাকবেন তো ?

—থাকব। যদি বেরিয়েও যাই, তোমার বৌদি তো থাকবেনই।

—ওয়েল। ইন দ্য মীন টাইম যদি বাড়ি ফেরে তাহলে অবশ্যই আমাকে রিং ব্যাক করবেন।

—নিশ্চই।

* * *

মনিকা মুখার্জি অর্থাৎ সাগর মুখার্জীর স্ত্রীর কাছ থেকে কয়েকটা মূল্যবান তথ্য পাওয়া গেল। চয়নের সঙ্গে অর্জুন সেন নামে একজন সহপাঠির বন্ধুত্ব ছিল হলায়গলায়। কিন্তু দুজনের দুটি দিকে প্রচণ্ড ন্যাক। চয়ন দারুন গান গাইতে পারে। তার গানের ব্যাপারে সাগরবাবু বা মনিকার কোন আপত্তি নেই। বরং ছেলের এই বিশেষ গুণটার জন্যে উভয়েই গর্বিত। আর অর্জুনের বিশেষ গুণ ছিল খেলায়। সে ভালো ফুটবল খেলে। এখনই সে সেকেণ্ড ডিভিশানে খেলছে একটি ভালো দলের হয়ে। পরের সিজনেই ফার্স্ট ডিভিশনে খেলার সুযোগ পেতে চলেছে। এই সূত্রে আরো একটি নাম এসে গেল। বর্ষা।

—আচ্ছা বৌদি, একটা কথা জিগ্যেস করা হয়নি। যেটা এই বয়েসের ধর্ম। বর্ষা কী আপনার ছেলের গার্ল ফ্রেণ্ড ?

—গার্ল ফ্রেণ্ড অথবা তারও থেকে বেশি কিছু সম্পর্ক ছিল কিনা সেটা চয়ন ভাল করে খুলে বলেনি তবে,

—কিছু লুকোবেন না বৌদি, নীলের কণ্ঠে আগ্রহ, ভালবাসা কিছু অন্যায় নয়। বিশেষ করে এই বয়েসে।

—এই যে বললাম। বর্ষার সঙ্গে চয়নের সম্পর্ক কী বা কতটুকু তা আমার জানা নেই। তবে, বর্ষা নামটা ওর মুখে প্রায়ই শুনতাম।

—কী বলতো ?

—সবটাই উচ্ছাস। সে নাকি ভালো নাচে। ভালো অভিনয় করে। এবার কলেজে বসন্তসেনার রোল করে দারুণ নাম করেছে। এমনি আরো কতো কী ?

—আপনি ওকে চোখে দেখেছেন ?

—না। আনব আনব করেও ওকে এ বাড়িতে কোন দিনও আনেনি।

—বর্ষার পুরো নাম কী ?

—বর্ষা মজুমদার।

—আর অর্জুনের ?

—অর্জুন রায়।

—এদের কোন ঠিকানা পাওয়া যাবে ?

—মনে হয় যাবে। একটু বসুন, চয়নের টেলিফোন ডায়েরীতে পাওয়া যেতে পারে।

এরপর দুটি ঠিকানাই পাওয়া গেল। অর্জুন থাকে বোসপুকুর কসবার দিকে। আর বর্ষা লেক গার্ডেন্স।

—পুলিশের দিক থেকে আর কোন খবর নেই। এইতো ?

—হ্যাঁ।

—ঠিক আছে বৌদি, আমাকে কটা দিন সময় দিন।

বাইরে আসতেই দীপু বলল, আমি একটা ইংরাজী ছবি দেখেছিলাম। তাতে ডিটেকটিভ মশায়ের চোর ধরতে গিয়ে ঠ্যাং ভেঙ্গে গিয়েছিল। ভদ্রলোককে হুইল চেয়ারে বসে দিন কাটাতে হত। তা সেই ভদ্রলোক ঐ চেয়ারে বসে বসেই সামনের বাড়ির একটা খুনের হদিশ করে ফেলেছিলেন।

—রেয়ার উইনডো। সম্ভবত গ্যারি কুপার ছিলেন ঐ রোলে। তা এখানে ও প্রসঙ্গ কেন ?

—তুমি ওই রকম কোন কেস পাওনা কেন বলতো নীলদা। তাহলে আর মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়াতে হয় না।

—পাইনি, পেলে করব। তবে আপাতত তোমার দুর্ভাগ্য আমার পা ভাঙ্গেনি। এবং যেতে হবে অর্জুন রায়ের বাড়ি।

—আগে বর্ষার বাড়ি গেলে হোত না ?

—কেন ? মনে বর্ষার অনুভূতি আসবে বলছিস ?

—আমি তো আর তোমার মতো প্রতিজ্ঞা করে বসিনি যে সারাজীবন শুধু খুনীদের পেছনে দৌড়ব। ইয়াং ল্যাড, মেয়েদের দেখলে আমার বেশ পুলক জাগে। আর প্রেম হলে তো মার দিস কেল্লা।

—শোন দীপু, আমি কোনদিনও বলিনি আমার মনে প্রেম নেই, ভালবাসা নেই। প্রতিজ্ঞা করিনি কেবল খুনী ধরেই জীবন কাটাব। জানিস, আমি একবার প্রেমে পড়েছিলাম, রানীগঞ্জের মেয়ে।

—তুমি ? প্রেম করেছিলে ? এরপর হয়তো শুনবো রোবটরাও প্রেম করে, বিয়ে করে। তা কাটাকুটি হলো কেন ?

—সে অনেক কথা। তোর অজুদা জানে। নে চ, বাস এসে গেছে।

নির্দিষ্ট ঠিকানা মিলিয়ে ওরা যখন অর্জুন রায়ের বাড়ি পৌঁছল তখন সাধারণতঃ লোকে কারো বাড়ি যেতে ইতস্তত করে। ঠিক দুপুর দুটো। নেহাত বর্ষার দিন। আকাশে মেঘের ঘটা। ফলে খটখটে আর চিড়বিড়ে রোদ ওদের জ্বালায়নি।

এদিকে এখন প্রমোটারদের দৌলতে নানা ধরনের বিল্ডিং উঠছে। আব কোনটাই তিনচারতলার নীচে নয়।

বাস থেকে নেমে ওরা অটো নিয়েছিল। এদিকে দুজনেরই আসা কম। ফলে অটো ড্রাইভারকেই জিজ্ঞাসা করতে হ'ল ঠিকানার অবস্থানটা কোথায়?

অটো ড্রাইভার অবশ্য বলেছিল, বেশী না। মাত্র মিনিট পাঁচেকের পথ। কিন্তু হাঁটতে গিয়ে টের পাওয়া গেল। পাঁচ নয় কুড়ি মিনিট। কোথাও মেঠো এবড়ো খেবড়ো রাস্তা কোথাও হয়তো সবে মাত্র ইট ফেলা হয়েছে।

বাড়িটা একটু ভেতরের দিকে। আশেপাশের বাড়িগুলোর থেকে বেশ ছোট। একতলা, ছাদ আছে, গ্রীলের দরজা। ভেতর থেকে চাবি বন্ধ। একটু খোঁজ করতেই কলিং বেল পাওয়া গেল। টিপতেই প্রায় মিনিট দুয়েক পর এক মহিলা বেরিয়ে এলেন। বছর চল্লিশ একচল্লিশের মতো বয়েস। সাধারণ চেহারা, রং ফরসা। চোখে কালো সরু সেলের ফ্রেম। দেখলেই মনে হবে উনি হয়তো কোন স্কুল মিস্ট্রেস। মহিলার মুখে উদ্বেগ। বেশ ব্যগ্রতা নিয়েই জিগ্যেস করলেন, আপনারা কোত্থেকে আসছেন?

—এটা কী অর্জুন রায়ের বাড়ি?

—হ্যাঁ। কিন্তু আপনারা?

—আমাদের ঠিক চিনবেন না। কিন্তু একটা বিশেষ কারণে আমরা অর্জুনবাবুর খোঁজ নিতে এসেছি।

মহিলাকে সামান্য হতাশ বলে মনে হোল।

—কেন অর্জুনবাবু কী বাড়ি নেই?

—পাঁচ দিন হোল সে বাড়ি ফিরছে না।

নীল আর দীপু তাকাতাকি করে নিল ক্ষণিকের অবসরে। তারপর নীল বলল।

—পাঁচ দিন বাড়ি ফিরছে না? কেন কোথাও গেছে?

প্রচণ্ড হতাশায় ভেঙ্গে পড়তে পড়তে মহিলা বললেন, জানি না। অর্জুনের খোঁজ রাখা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু আপনারা এত কথা জিগ্যেস করছেন কেন? আপনারা কী তার কোন খোঁজ পেয়েছেন?

—না। আর সেই কারণেই আমাদের আসা।

বলেই নীল পকেট থেকে নিজের কার্ডটা এগিয়ে দেয়। মহিলা নীলের প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটরের পরিচয় পেয়ে আরো আশঙ্কিত হয়ে পড়লেন।

তারপর গ্রীল গেট খুলে তাদের ভেতরে নিয়ে গিয়ে ডাইনিং রুম সিটিং স্পেসে নিয়ে বসালেন। খুবই ছোট্ট ফ্ল্যাট। দুটো শোবার ঘর। একটা বাথ একটা কিচেন। ছোট্ট করিডোর ঘিরে এদের অবস্থান।

সোফায় বসে নীল মুখটা মুছে নিল। দেখাদেখি দীপুও। মহিলা সামনের খালি কাঠের চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, আপনি বললেন সেই কারণেই আপনাদের আসা। কারণটা কী বলবেন?

—তার আগে আপনার পরিচয়টা পেলে ভাল হোত?

—আমি শমিতা রায়। অর্জুনের মা।

—আঁচ করেছিলাম। আপনি কী কোন সার্ভিসে আছেন?

—হ্যাঁ। সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের নীচুতলার কর্মী। এল ডি ক্লার্ক। আসলে, আমার স্বামী ভাস্বর রায় মারা যাবার পর চাকরিটা পেয়ে যাই। নইলে,

—ছোট্ট হলেও বাড়িটা খুব বেশী দিনের না বলেই মনে হচ্ছে।

—ঠিকই ধরেছেন। মাত্র দশ বছরের। বাড়িটা যেমন দেখছেন ঐ টুকুই শেষ করে ভাস্বর। গৃহ প্রবেশের ঠিক এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই,

—ঠিক আছে, ঠিক আছে, ও প্রসঙ্গ থাক। এখন বলুন অর্জুনবাবু পাঁচ দিন বাড়ি ফিরছে না। এ নিয়ে কোন তল্লাসী করেন নি?

—কোরব। আরো কয়েকটা দিন দেখে।

—কেন? ও কী প্রায়ই এ রকম করে?

শাড়ির আঁচলটা আঙ্গুলে জড়াতে জড়াতে শমিতা বললেন, হ্যাঁ। প্রায়ই করে। একবার তো পনেরো দিন পর বাড়ি ফিরল।

—কোথায় যায়? কোন আত্মীয়ের বাড়ি?

—আত্মীয় বলতে আমার শ্বশুর বাড়ি। কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখেছি ও সে সব জায়গায় যায় না।

—তাহলে যায় কোথায়?

চট্ করে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন না শমিতা।

—বলতে বাধা আছে?

—না। তবে ওকে জিগ্যেস করেও উত্তর পাই না। বাট আই ডাউট সামথিং।

—হোয়াট সামথিং? আমাদের খুলে বলুন। কারণ আমরা একটা ইনভেস্টিগেশনের জন্যে এসেছি।

—ইনভেস্টিগেশন, শমিতার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছিল, কিসের ইন-ভেস্টিগেশন?

—আচ্ছা মিসেস রায়, চয়ন মুখার্জি বলে কারো নাম আপনি শুনেছেন?

—চয়ন আর অর্জুন একেবারে গায়ে গা ঠেকানো বন্ধু।

—আই সী ?

—কিন্তু চয়নের প্রসঙ্গ এখানে এলো কেন ?

—আপনার কাছে লুকিয়ে লাভ নেই। গত পাঁচ দিন ধরে চয়নকেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

—বাঁচালেন। আমার মনে হয় ওরা একসঙ্গে কোথাও গেছে ? সেটাই হ'তে পারে।

—জানি না। এখনই সেটা বলতে পারব না।

প্যাকেট থেকে সিগারেট বার করে নীল বলল, ইফ ইউ ডোণ্ট মাইণ্ড!

—ওহ্ সিওর। সিগারেট এখন কোন প্রবলেমই নয়।

সিগারেটে কয়েকটা মোক্ষম টান দিতে দিতে নীল প্রশ্ন করে, ম্যাডাম, দুজনের একসঙ্গে নিরুদ্দিষ্ট হওয়াটা কোন বিচিত্র নয়। এবং একা না হয়ে দুজন একসঙ্গে থাকলে আশঙ্কার দিকটা কমে যায়। কিন্তু সেটা বিশেষ কোন নিরাপত্তার আশ্বাস দেয় না। ওয়েল, আর একটা প্রশ্ন করি,

—এনি গার্ল ফ্রেণ্ড ?

—অর্জুনের সঙ্গে একটা মেয়ের অ্যাফেয়ার্স গ্রো করেছিল।

—করেছিল বলছেন কেন ?

—বর্ষা মেয়েটাকে আমার খুব স্যালো চরিত্রের মেয়ে বলে মনে হয়।

—কী নাম বললেন ? বর্ষা মজুমদার ?

—হ্যাঁ। কিন্তু আপনারা তাকে চিনলেন কেমন করে ?

—চয়নের বাড়ি গেলে ঐ একই নাম পেয়েছি। আর আশ্চর্যের কথা হচ্ছে, চয়নের মাও ঠিক একই কথা বললেন। চয়নের সঙ্গে বর্ষার একটা ক্লোজ ইনটিমেসী ছিল। সেটা অ্যাফেয়ার্স কিনা সে সম্বন্ধে উনি সিওর নন। এদিকে আপনি বলছেন !

—আজকালকার ছেলেমেয়েদের মনের হদিশ পাওয়া আমার পক্ষে বেশ কষ্টকর। আই মিন আমার পক্ষে এদের চাল-চলন, ডেয়ারিং ভাব, মা-বাবার প্রতি অবজ্ঞা, তাদের মুখের দিকে তাকাবারও যেন অবকাশ নেই। আমাদের ছোট বেলাটা কী অদ্ভুতভাবে পিছলে গেল। আমরাও তো একদিন ছোট ছিলাম মিস্টার ব্যানার্জি। কিন্তু এরকম বেপরোয়া ভাব ? যা খুশী তাই করার এত বেশী প্রবণতা দেখে মাঝে মাঝে আমার বড় ভয় করে। এরা কী সত্যিই ঠিক পথে এগিয়ে চলছে ?

মৃদু হেসে নীল বলল, কেঁদে অথবা ভেবে কোন লাভ নেই ম্যাডাম। একটা জেনারেশন গ্যাপ। আমরা এদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারব কিনা জানি না। তবে পিছিয়ে পড়ছি এটা বলতে পারি।

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে শমিতা বলেন, এর নাম কী এগিয়ে যাওয়া ? কারোর

প্রতি কোন শ্রদ্ধা নেই, ভালবাসা নেই, দায়-দায়িত্ব বোধ নেই। পুরনো মূল্য-বোধগুলো এদের কাছে যেন বস্তাপচা কিছু। এমন কী সামান্য কর্তব্যবোধও ওদের মধ্যে নেই। ওরা এমন ভাব করে যেন দয়া করে বাবা-মায়ের কাছে থেকে তাদেয় কৃতার্থ করছে। আমাদের সব ধ্যানধারণা কী একফুঁয়ে উড়িয়ে দেওয়া যায়?

—আপনার কোন কথাকেই অস্বীকার করার উপায় আমার নেই। আমি নিজেও ফীল করি বর্তমান যুব সমাজে বিরাট একটা পরিবর্তনের ঢেউ এসে আছড়ে পড়েছে। পরিবর্তন আসে। কিন্তু ফলাফল বলে দেয় ভবিষ্যৎ। লেট আস ওয়েট ফর দি ফিউচার। ইট মাইট বী বেস্ট অর ওয়ার্স্ট। এবার অর্জুন সম্বন্ধে কিছু বলুন।

—অর্জুন আমার অতি সাধারণ ছেলে। আর পাঁচটা নিম্ন মধ্যবিত্ত বাঙালি ছেলের মতোই সে ছিল। ওর বাবা যে ফার্মে চাকরি করতেন, ওনার হঠাৎ মৃত্যুর পর নিয়ম অনুসারে আমি একটা চাকরি পাই। বাড়িটা ওর বাবা কোনমতে শেষ করে গেলেও, মৃত্যুর পর দেখলাম হাতে আর আমাদের বিশেষ কিছু নেই। চাকরিটা পাবার পর ছেলেকে কণ্টেসৃস্টে পড়ানো আর সংসার চালানো সবই করে আসছি। তবু, তাতেও আমার একটা সুখ ছিল। অর্জুন ভালো ফুটবল খেলতো। আপত্তি করিনি। ভাবতাম অর্জুন মানুষের মত মানুষ হয়ে একদিন এ সংসারের ভার নেবে। কিন্তু,

—কিন্তু?

—সব একদিন ওলটপালট হয়ে গেল। আমাকে নটার মধ্যেই অফিসে বেরিয়ে যেতে হয়। ভোরবেলা উঠে বাজার, রান্না, অর্জুনের খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত সব একা হাতে সেরে বেরিয়ে যেতাম। একটু বেশী টাকা রোজগার করার জন্যে ওভারটাইমও করতে হোত। বাড়ি ফিরতাম সেই রাত নটায়। একেবারে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে।

—আপনার বাড়িতে কাজের লোক নেই?

—প্রথমত ক্ষমতা নেই। দ্বিতীয়ত অনেক বেশী টাকা দিয়েও যারা কাজ করতে আসতো তাদের দেমাক আর মর্জিতে, যখন ইচ্ছে আসা অথবা না আসাকে ঠিক মানিয়ে নিতে পারিনি। তাই একা হাতেই সব করতাম।

—বেশ তারপর?

—একদিন কী একটা অকেশনে তাড়াতাড়ি অফিস ছুটি হয়ে যায়। বাড়িতে এসে দেখলাম বাইরের গ্রীল গেট ভেতর থেকে তালাবন্ধ। বুঝলাম অর্জুন বাড়ি ফিরে এসেছে। তাই বেল না দিয়ে নিজের ডুপ্লিকেট চাবি খুলে ভেতরে গিয়ে দেখলাম অর্জুনের ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। ভেবেছিলাম ও হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। ওকে না ডেকে নিজের ঘরেই চলে যাচ্ছিলাম।

হঠাৎ দেখলাম একটা লেডিজ মড্ টাইপ জুতো। যেটা আমার নয়। কারন শীতকালে পা ঢাকা আর বাদবাকি সময়ে চটি পরেই আমার চলে যায়। হঠাৎ আমার কী যেন সন্দেহ হলো। অর্জুনের ঘরে গিয়ে ধাক্কা দিলাম। দু-তিনবার ধাক্কা দেবার পর মুখে একরাশ বিরক্তি নিয়ে অর্জুন আধখোলা দরজা আটকে যে অদ্ভুত ভাষায় আমার সঙ্গে কথা বলল তা শোনার জন্যে আমার কোন মানসিক প্রস্তুতি ছিল না।

—কী বলেছিল সে?

—তুমি? এখন? তোমার তো এসময়ে ফেরার কথা নয়?

আমি সহজ ভাবেই উত্তর দিয়েছিলাম, হ্যাঁ, হঠাৎ একজন ডাইরেক্টর মারা যাওয়ায় ছুটি হয়ে গেল। ঘরে কী আর কেউ আছে?

—থাকতেই পারে। দ্যাটস্ নন অব ইউর বিজনেশ।

আমার সামনেটা সেই মুহূর্তে দুলে উঠেছিল। সেই শান্ত, ভদ্র, মায়ের একান্ত অনুগত ছেলেটার মুখে এসব কী শুনছি? মাথা ঠাণ্ডা রেখে আমি জিগ্যেস করেছিলাম, সেকী, তোমার ঘরে কে আছে না আছে, সেটা খোঁজ রাখার কোন দরকার আমার নেই?

—নো। আমি কোন পার্শোন্যাল ইণ্টারফেয়ারেন্স পছন্দ করি না। হ্যাভ হউ সীন, আমি তোমার কোন ব্যাপারে নোজ পোক করেছি?

মিস্টার ব্যানার্জি। বিশ্বাস করুন সেই মুহূর্তে আমার মনে হয়েছিল ওর এক একটি শব্দ আমার সামনে বজ্রাঘাত হয়ে আছড়ে পড়ছে। কোন রকমে আমি বলেছিলাম, এ সব কী বলছিস খোকা? তুই আমার অসাক্ষাতে বাড়িতে বসে দরজা বন্ধ করে একটি মেয়েকে নিয়ে গল্প করবি, আর আমি কিছু প্রশ্নও করতে পারব না? পাড়ার লোক জানলে কী বলবে?

অর্জুন মেজাজ চড়িয়ে বলেছিল, ড্যাম ইওর পাড়ার লোক। হু কেয়ারস্ দেম। আমার ফ্ল্যাটে, আমার ঘরে বসে আমি আমার গার্ল ফ্রেণ্ডকে নিয়ে গল্প করতেই পারি।

ধীরে ধীরে আমিও নিজেকে ফিরে পাচ্ছিলাম। ফিরে আসছিল একটা অভিভাবকীয় মেজাজ। একজন মা, যিনি তখন আদর নয় শাসন করতে এসেছেন। বলেছিলাম, না অর্জুন এটা এ ফ্যামিলির রেওয়াজ নয়। তোমার কোন পুরুষ বন্ধু হলে, ধর চয়ন বা অন্য কেউ, আমার কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু মেয়ে বন্ধু নিয়ে নির্জন বাড়িতে ঘরের দরজা বন্ধ করে থাকতে পার না।

—ক্যান য়ু স্যে, হোয়াট্স্ দ্যা ডিভারেন্স বিটুইন আঁ বয় অ্যাণ্ড গার্ল?

—সেটা বোঝার বয়েস তোমার হয়েছে। এবং এটা কেন দৃষ্টিকটু তা

বোঝার বুদ্ধিও তোমার হয়েছে। যাই হোক এ ব্যাপারে আমি তোমার সঙ্গে কোন তর্কে যেতে চাই না। তুমি বরং মেয়েটিকে ডাক, আমি তার সঙ্গে কিছু কথা বলব।

তবু জেদ চাপিয়ে অর্জুন বলেছিল, তুমি কী আমাদের সন্দেহ করছ? বাট আই ডিড্ নাথিং রং।

—সেটা তো খুবই ভাল কথা। তবু আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

অর্জুন কিছু বলার আগেই মেয়েটি বেরিয়ে এসেছিল। দেখে আমি চমকে গিয়েছিলাম। পরণে একটা বয়েজ সার্ট আর খুব টাইট একটা জীনস্ প্যাণ্ট। বয়েজ কাটেই ছাঁটা চুল। আর শরীর স্বাস্থ্যে এবং মুখশ্রীর সৌন্দর্যে মেয়েটি এক কথায় আমার ছেলের কাছে বড়ই আনম্যাচিং। নিশ্চই খুব বড়লোকের মেয়ে। হয়ত ঐ মেয়ের দৈনিক হাত খরচই হাজার টাকা। মেয়েটিকে দেখে আমার প্রথমেই যে কথাটা মনে হয়েছিল, সেটা হ'ল এ মেয়ে যদি কোন অঘটনে বউ হয়ে আসে, আমার তিল তিল করে গড়া সংসারটা টুকরো হয়ে যাবে। আমি কিছু বলার আগেই মেয়েটি বলে উঠল, হাই আণ্টি, আই অ্যাম বর্ষা মজুমদার। দ্য ওনলি ডটার অব চিফ জাস্টিস নলিনবরণ মজুমদার। আহ্যাভ হার্ড এভরি ল্যাঙ্গুয়েজ অব ইওর। বাট স্যারি টু স্যে ইউ আর বিলংগিং ইন নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি।

—ভাল কথা। কিন্তু এই ছোট্ট বাড়িটার মালিক এখনও আমি। তাই, আমি যে শতাব্দীতেই বাস করি না কেন আমার একটা লিভিং স্টেটাস আছে যেটা কিছু এথিক্সের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। আমি চাই না বিবাহিত জীবনের আগে একা নির্জন বাড়িতে একটি ছেলে এবং মেয়ে দরজা বন্ধ করে একসঙ্গে বসে সময় কাটাক।

—ওহ্ আণ্টি, ইউ আর ভেরী ব্যাকডেটেড ওম্যান। সস্তা মিডল্ ক্লাস অরথোডক্সের কোন মানে নেই। লাইফ ইজ ভেরী ফাস্ট টু ডে।

—তুমি মেয়ে হয়ে এ কথা বলছ?

—হোয়াই নট? মেয়েরা আজ কোনভাবেই ছেলেদের থেকে পিছিয়ে থাকতে রাজী নয়।

—শোন বর্ষা, তুমি যেটা বলছ সেটা স্ত্রী স্বাধীনতা নয়। সেটা স্বেচ্ছাচারিতা।

কাঁধ স্রাগ করে সেদিন বর্ষা বলেছিল, ওয়েল, দ্যাট্স্ ইওর ওপিনিয়ন। নাউ লিস্ন আওয়ার ডিসিশান, আই লাইক ইওর সান অর্জুন। উই ওয়াণ্ট ইচাদার। সো উই হ্যাভ ফাইনালাইজড্ দ্যাট উই মাস্ট লিভ টুগেদার। ইট মাইট বী হীয়ার, অফ কোর্স ইওর পারমিশান ইজ আ ফ্যাক্টর।

—আর আমি যদি মত না দিই।

—দেন, দেয়ার ইজ মাই হাউস। আ বিগ ওয়ান।

—তোমার বাবা মা এটা মেনে নেবেন ?

—ওহ্ হোয়াই নট। দে আর নট সো ব্যাক ডেটেড। ওয়েল অর্জুন, নাউ ইউ ডিসাইড হোয়েদার ইউ উইল স্টে উইথ ইওর মাদার অর নট। ইট ডিপেন্ডস্ অন ইউ।

প্রায় মিনিট তিনেক ফিতের ফাঁসের খেলা শেষ করে বর্ষা জুতো পরে বেরিয়ে যাবার সময় অর্জুনের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, অর্জুন, উড্ ইউ প্লীজ অ্যাকম্প্যানি মী ?

ওরা দুজন আমার নিম্ন মধ্যবিত্ত সেন্টিমেন্টকে মূল্য না দিয়ে আমার মুখে অপমানের থাপ্পড় কষিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছিল।

নীল আর দীপু একমনে শমিতা দেবীর কথাগুলো শুনে যাচ্ছিল। দীপুই কথা বলল, অর্জুন কী তারপর থেকেই এ বাড়িতে আসছে না ?

—না ভাই। তাহলেও নয় তার চলে যাওয়ার একটা অর্থ খুঁজে পেতাম। কিন্তু কিছুদিন পরই টের পলাম অর্জুন যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে। কেমন মিইয়ে গেছে। আমার সঙ্গে কোন কথাই বলে না। নিজের মনে থাকে। কখন আসে কখন যায়। বাড়ির খাওয়া দাওয়া সব ছেড়েই দিয়েছে। পড়া-বা খেলাধুলো কিছুই করে না। এরপর একদিন অনেক রাতে ফিরল এক পেট মদ খেয়ে। সেই শুরু। তারপর সেটাও বন্ধ হয়ে গেল। কেমন একটা ঘোর নিয়ে বাড়ি আসতো। মুখে কোন অ্যালকোহলের গন্ধ পেতাম না। কিন্তু বুঝতে পারতাম ও অন্য কোন নেশা করছে। যার কোন গন্ধ থাকে না থাকে শুধু নির্জীব হয়ে যাওয়া অভিব্যক্তি। তবু সেই ভাবেই বেশ কিছুদিন বাড়ি ফিরলো। কিন্তু ইদানীং, মিস্টার ব্যানার্জি আমি বড় ক্লান্ত। বড় অভিশপ্ত।

সামান্য সময়ের জন্যে নীল চুপ করে থাকল। কিছু সঙ্কটের সময় আসে যখন মানুষকে ধাতস্থ হবার জন্যে সময় ধার করতে হয়। তারপর এক সময় ও জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা মিসেস রায় আপনি তো বললেন চয়নের সঙ্গে অর্জুনের বন্ধুত্ব বেশ গভীর।

—হ্যাঁ। এইসব ঘটনার আগে চয়নই ছিল ওর একমাত্র বন্ধু। চয়ন বড়লোকের ছেলে হলেও ওর মধ্যে সে সবের কোনও চিহ্নই ছিল না। কতদিন ঐ ঘরে বসে চয়ন আমাদের কত গান শুনিয়েছে। কতদিন দু বন্ধু মিলে রান্না করেছে। সারাদিন হয়তো দু'জনে ক্যারাম খেলেই কাটিয়ে দিয়েছে।

—হ্যাঁ শুনেছি চয়ন খুব ভালো গান গাইতে পারতো।

—শুধু ভালো নয়, রীতিমত ভালো। ও তো প্রায়ই বলতো, মাসীমা,

বাবা চান আমি বড় মাপের ব্যারিস্টার হই। কিন্তু আমার ইচ্ছে বড় গায়ক হবার।

—বেশ, তারপর ?

—কী যে হোল দুজনের মধ্যে। চয়ন এ বাড়ি আসা বন্ধ করে দিল। আমি অর্জুনকে জিগ্যেস করলে বলতো, যার ইচ্ছে হবে আসবে না হলে আসবে না। এতে এতো ভাবার কী আছে ?

ভ্রু দুটো কুঁচকে নীল কয়েক মিনিট শমিতার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর জিগ্যেস করল, ওদের মধ্যে দ্বন্দ্বটা কী নিয়ে হয়েছিল, জানেন কিছু ?

—না। চয়নের বাড়িতে দু তিনবার ফোন করেও ওকে ধরতে পারিনি। ভেবেছিলাম আবার একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে।

—বর্ষা যখন এ বাড়িতে আসতো তখন কী চয়ন এ বাড়িতে আসা যাওয়া করতো ?

—তা তো বলতে পারবো না মিস্টার ব্যানার্জি। কারণ বর্ষাকে আমি একদিনই দেখেছি। এবং সেই ঘটনার পর বর্ষা আর কোনদিনও এ বাড়িতে আসেনি। হলফ করে বলতে পারব না। কারণ ছুটির দিন ছাড়া আমি বাড়িতে কতটুকুই বা থাকতাম।

—ঠিক আছে ম্যাডাম। আজ আমরা চলি। অর্জুন ফিরলে আমায় কষ্ট করে একবার রিঙ করবেন।

নীল উঠে পড়েছিল। কিন্তু শমিতা এবার পাল্টা প্রশ্ন তুলল, কার্ডে দেখলাম আপনি প্রাইভেট ইনভেস্টিগ্যেটর। অর্জুন সম্বন্ধে অনেক কিছু জানলেন। আমার ছেলের কী কিছু হয়েছে ? প্লীজ, আমার কাছে আপনি কিছু লুকোবেন না।

—মিসেস রায়, অর্জুন এখন ঠিক কোথায় আছে, কেমন আছে তার কিছুই জানিনা না। আমি এসেছিলাম চয়নের ব্যাপারে অর্জুন কিছু জানে কিনা সেই খবর নিতে।

—চয়নের ব্যাপারে বলতে আপনি কী মীন করছেন ?

—ঠিক আপনার ছেলের মতোই আজ পাঁচদিন হোল চয়নকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কেন চয়নের বাবা আপনার কাছে খোঁজ খবর নিতে আসেন নি ?

—কই না তো! অন্তত আমার জানা নেই।

—অর্জুন বাড়িতে না ফেরা সত্ত্বেও কী আপনি অফিস যাতায়াত করেছেন ?

—হ্যাঁ। কারণ অর্জুন তো প্রায়ই এ রকম করে। আর সেই জন্যে তো দিনের পর দিন অফিস কামাই করা সম্ভব নয়।

—তা বটে। ঠিক আছে মিসেস রায় আপনাকে অনেক বিরক্ত করলাম। অর্জুন ফিরলেই কিন্তু জানাবেন।

রাস্তায় নেমে দীপু জিজ্ঞাসা করল, এবার তাহলে বর্ষা মজুমদার ?

—নিশ্চই।

—আচ্ছা গুরু আমার একটা খট্‌কা লাগছে।

—বলে ফ্যাল।

—একটা ত্রিভুজ প্রেমের গন্ধ পাচ্ছি।

—কী রকম ?

—বর্ষা ভালবাসতো অর্জুনকে।

—বাসতো কী ?

—লীভ টোগেদার করতে চাইছিল যে মেয়ে, ভালোটালো না বাসলে কোন মেয়ের পক্ষে কী কোন ছেলেকে নিয়ে রাত্রিবাস করা সম্ভব ? বর্ষা ইজ নট আ প্রসটিটিউট।

—এখনই এতো কিছু ভেবে নিতে আমি রাজী নই। অ্যাটলীস্ট বর্ষাকে মিট্ না করা পর্যন্ত।

—তা বটে। তবে মিসেস রায়ের ভাসানে বর্ষাকে খুব একটা পিওর মেয়ে বলে মনে হচ্ছে না।

—দেখাই যাক।

বর্ষার বাড়িতে ওরা যখন পৌঁছল তখন ভর সন্ধ্যে পার হয়ে গেছে। নীল ঘড়ি দেখল। সাতটা। আনোয়ার শাহ্ রোড ধরে পশ্চিমমুখে খানিকটা গিয়েই ডানদিকে মোড় ঘুরতেই বর্ষার বাড়ি। খোঁজার বিশেষ ঝামেলা ছিল না।

বিশাল বড় না হলেও নেহাৎ ছোট বাড়িও নয়। বাড়ির সামনের অংশটায় ছোট্ট লন। চৌকো গ্রীল দিয়ে ঘেরা। গ্রীলের দরজা ভেজানো ছিল। ঠেলতেই খুলে গেল। ছোট নুড়ি পাথরের রাস্তা চলে গেছে বাড়ির দরজা পর্যন্ত। দু ধাপ শ্বেত পাথরের সিঁড়ি এবং সামনেই পালিশ করা দরজা। দরজা বন্ধ। নেমপ্লেটে লেখা নলিনবরণ মজুমদার। কলিংবেল ছিল। বার দুয়েক টেপার পর মাঝবয়েসী এক মহিলা এসে দরজা খুলে দাঁড়াল।

—বর্ষা আছে ?

—হ্যাঁ। দিদিমণি এই মাত্তর ফিরলেন।

কথাতেই বোঝা গেল কাজের মেয়ে। নীল বলল, দিদিমণিকে একটু ডাকা যাবে ?

—কিন্তু আপনারা কারা ? গিয়ে কী বলবো ?

—বলবে মানে। ঠিক আছে, পকেট থেকে নিজের কার্ড বার করে

মেয়েটির হাতে দিয়ে বলল, এটা পেঁছে দিলেই উনি বুঝতে পারবেন। বাড়িতে আর কে আছেন ?

—এখন তো কেউ নেই। বড়বাবু ফেরেন নি। আর মা গেছেন মার্কেটিং করতে।

—ঠিক আছে তুমি একটু খবর দাও।

—আপনারা বসুন। আমি খবর করছি।

সোফায় বসতে বসতে দীপু বলল, কাজটা কী ঠিক করল ?

—আবার কে কী করল ?

—এই যে মেয়েটি, আমাদের চেনে না, জানে না। বাড়িতে একটি সোমত্ত মেয়ে ছাড়া আর কেউ নেই, বেমালুম পারলারে বসিয়ে ওপরে উঠে গেল। আমরা ডাকাত ফাকাতও হতে পারতুম তো !

—এরবার সিঁড়ির মাথায় তাকিয়ে দেখ।

দীপু পারলার থেকে উঠে যাওয়া সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, ওরে বাবা। ছাড়া পেলে আর দেখতে হবে না।

হ্যাঁ, দুটো ভীষণ আকারের গ্রে হাউণ্ড। সম্ভবত বাঁধা আছে। কিন্তু সমানে গর্‌র্‌ আওয়াজ করে চলেছে।

মিনিট খানেকের মধ্যেই দারুণ বাটিক প্রিণ্টের ম্যাক্সি ঢাকা, ততোধিক দারুণ রূপসী এক তম্বিকে দেখা গেল। তার হাতে নীলের দেওয়া কার্ড ধরা আছে। মেয়েটি একবার কুকুর দুটোর মাথায় হাত ছুঁইয়ে নীচে নেমে এল। চলার মধ্যে দাম্ভিকতার ছোঁয়া। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো দুজনের দিকে। আচ্ছন্ন করার মতো দৃষ্টি। তীক্ষ্ন এবং ধারালো। এবং আবিষ্ট করার শক্তি রাখে। রঙে আর স্বাস্থ্যে যৌবন যেন উথলে পড়ছে। দীপু মনে মনে ভাবল, এ শালার মেয়ে বহু ছেলের মাথা চিবোবে। হয়তো বলেই ফেলতো। ঠোঁট কাটা ছেলে। কিন্তু নীলের দিকে তাকিয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

—আমি নীলাঞ্জন ব্যানার্জি। পরিচয়টা কার্ডেই লেখা আছে।

—ওয়েল। বাট হোয়াই আ প্রাইভেট ডিটেকটিভ হ্যাজ কাম টু মিট মী ?

—বলব। সব বলব বলেই তো আসা।

—বী সিটেড প্লীজ।

মনে মনে দীপু ভাবছিল এ মেয়ে কোন্ লণ্ডনে জন্মেছে। বাংলা বলতে জানে না নাকি ? শোফায় বসতে বসতে নীল বলল, আপনিই নিশ্চই বর্ষা মজুমদার।

—ইয়েস, ইট্‌স্ ফ্যাক্ট, নাউ টেল মী হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ ?

ভণিতা না করে নীল সরাসরি প্রশ্নে গেল, চয়ন মুখার্জিকে চেনেন ?

হঠাৎ যেন বর্ষার মুখে বিদ্যুতের তরঙ্গ খেলে গেল। রক্তিম হ'তে গিয়েও একটা চাপা বিষন্নতা ফুটে উঠল, ভাবিত স্বরে বলল, হ্যাঁ, চিনি।

—কী রকম চেনেন?

—হোয়াট ডু ইউ মীন, ঘোর কাটিয়ে ফিরে এল দাম্ভিকতা, বর্ষার মুখে।

—অন্যভাবে নেবেন না। কথাটা জিগ্যেস করার পেছনে একটা বড় কারণ আছে।

—কারণটাই আগে শুনি।

—প্রায় পাঁচদিন হ'ল চয়নকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, কথাটা কী জানেন?

বর্ষা খানিকক্ষণ মাথা নীচু করে রইল। কপালে হাত দেওয়ার ছলে সম্ভবত চোখ দুটো ঢাকতে চাইছিল।

—মিস্ মজুমদার!

ধীরে ধীরে বর্ষা মুখ তুলে তাকালো। কে বলবে এই মেয়ের চোখেই একটু আগে ছিল ঔদ্ধত্য। দীপুর মনে হ'ল বর্ষার চোখে বর্ষা নামতে বেশী দেরী নেই।

—খবরটা কী আপনি শুনেছেন, নীল আবার প্রশ্ন রাখল।

শব্দ করে উত্তর না দিয়ে ও কেবল মাথা নাড়িয়ে সায় দিল।

—তাহলে শুনেছেন। কার কাছ থেকে?

—ওর বাবাই আমাকে ফোন করেছিল। হি র‍্যাং মী অ্যাটলীস্ট ফাইভ অর সিক্স্ টাইমস্।

—কেন মিস্ মজুমদার, উনি আপনাকেই বা এতোবার ফোন করলেন কেন?

—বিকজ,

—হ্যাঁ, বলুন

—উই আর এনগেজ্‌ড্। উই লাভ ইচাদার।

—মিস্ মজুমদার, চয়নের মায়ের মুখ থেকে আপনাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের কথা শুনেছি। কিন্তু এতোটা নয়। কিন্তু,

—এর মধ্যে ইফ্ বাট-এর কোন পাঁচিল নেই মিস্টার ব্যানার্জি। অ্যান্ড্ আয়াম ভেরী মাচ ওরিড। আমি কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না চয়ন কোথায় যেতে পারে। আমাকে কিছু না বলে কোথাও যাবে এমন তো হ'তে পারে না।

—আমার 'কিন্তু'র ছেদ এখনও টানিনি মিস্ মজুমদার। আমার প্রশ্ন, চয়নকে আপনি ভালবাসেন, এবং তাকে বিয়ে করবেন। বাট্ হোয়াট্‌স্ অ্যাবাউট অর্জুন রায়?

—ইট্‌স্‌ আ স্যাড স্টোরি। আই ফীল ফর অর্জুন। বাট আয়াম হেল্পলেস।

—কী রকম? আপনি নিজেই তো একদিন অর্জুনের মায়ের কাছে স্বীকার করে এসেছিলেন অর্জুনের সঙ্গে আপনি লীভ টোগেদার করতে চান।

নিজের মনেই নর্থক মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বর্ষা বলল, দ্যাট ডে আই হ্যাড নো আদার ওয়ে, বাট টু স্যে দোজ ডার্টি ওয়ার্ডস। বিশ্বাস করুন মিস্টার ব্যানার্জি, মাসীমা সেদিন এমন নোংরা ইঙ্গিত দিয়ে কথা বলছিলেন, আমাকে বাধ্য হয়েই লীভ টোগেদারের কথা বলতে হয়েছিল।

—তার মানে আপনি বলছেন অর্জুনের সঙ্গে কোন,

—অর্জুন ইজ মাই ফ্রেন্ড। আ ভেরী গুড ফ্রেন্ড। হ্যাঁ, আমার স্বীকার করতে কোন অসুবিধা নেই যে অর্জুন হ্যাড আ সফ্‌ট্‌ কর্ণার ফর মী। এটা কোন অন্যায় কিছু নয়। একসঙ্গে মেলামেশা করতে করতে আমাকে তার ভাল লেগেছিল। হয়তো এখনও ভালবাসে। বাট স্যরি টু স্যে আই লাভ চয়ন।

—অর্থাৎ আপনার দিক থেকে অর্জুনের প্রতি সেই অর্থে কোন দুর্বলতা নেই।

—বললাম তো অর্জুন ইজ মাই গুড ফ্রেন্ড।

অর্জুন যে আপনাকে ভালবাসে সেটা কী চয়ন জানে?

—দ্যাট আই কাণ্ট স্যে। হয়তো জানে কিংবা জানে না। কারণ চয়নকে আমি অর্জুনের দুর্বলতার কথা জানাইনি।

—কেন?

—অর্জুন আর চয়ন, এরা একে অপরকে ছেড়ে থাকতে পারে না এতই ওদের মধ্যে নিবিড় বন্ধুত্ব। দেআর ভেরী মাচ্‌ বুজ্‌ম ফ্রেণ্ড্‌স্‌।

—অর্জুন কী জানে আপনারা দুজন দুজনকে ভালবাসেন?

—ইয়েস। অর্জুন যখন আমাকে প্রোপজ করে তখনই আমি ওর কাছে সব কিছু খুলে বলি। অ্যাণ্ড ইট ওয়াজ দ্যাট ডে হোয়েন উই ওয়্যার ইন হিজ হাউস।

—তারমানে আপনি ঐ একদিনই অর্জুনের বাড়ি গিয়েছিলেন?

—ইয়েস। অর্জুন বলেছিল ওর কী বিশেষ কথা আছে। সো আই ওয়েণ্ট দেয়ার। আয়াম স্যরি, মাসীমাকে আমি ঐ সব কথা বলেছিলাম। আসলে অর্জুনকে রিফিউজ করা, তারপরেই মাসীমার ঐ সব কথা, আই ওয়াজ ট্যোটালি গন ম্যাড।

—এরপর আর অর্জুনের সঙ্গে আপনার দেখা হয়নি?

—হয়েছিল। দেখলাম ও নেশা করা শুরু করেছে। দেবদাস হওয়াটা কোন কাজের কথা নয়। আমি ওকে বোঝাতে চেয়েছিলাম। বাট অর্জুন

আমার কথার মূল্য দেয়নি। আমি ওর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ টেমপোরারিলি বন্ধ করে দিয়েছিলাম। র‍্যাদার আই ওয়াণ্টেড টু হেল্প হিম টু ফরগেট মী। একটা প্রোভার্ব আছে। ভেরী কমন, আউট অব সাইট আউট অব মাইণ্ড।

—অর্জুন এখন কোথায় তা জানেন ?

—না।

—চয়নের সঙ্গে সঙ্গে হি ইজ অলসো অ্যাবস্কণ্ডেড।

—হোয়াট ? কী বলতে চাইছেন আপনি ?

—হ্যাঁ, এটাই সত্য। দিন পাঁচ ছয় হ'ল অর্জুন বাড়ি ফেরেনি।

—মাসীমা আই মীন অর্জুনের মা কী বলছেন ?

—অর্জুন নাকি আজকাল প্রায়ই বাড়ি ফিরতো না। তিন চারদিনের মতো হঠাৎ হঠাৎ কোথাও উধাও হ'য়ে যেত। মানেটা কিন্তু ভয়ংকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

—হোয়াট অ্যাকচুয়ালি ইউ ওয়াণ্ট টু স্যে মী! ক্লীয়ার ইট প্লীজ।

—আমরা নিজেরাই কোন ক্লীয়ার জায়গায় নেই। তাই আপনার প্রশ্নের উত্তরও দিতে পারছি না।

—কিন্তু ভয়ংকর কিছু বলতে আপনি কী মীন করছেন ?

—কিছু মনে করবেন না। আমাদের স্বভাবটাই হচ্ছে প্রথমে খারাপ কিছু ভেবে নেওয়া।

—আমি তো সেটাই শুনতে চাইছি।

—নো ম্যাডাম। আগেই বলেছি বলার মতো জায়গায় আমরা এখনও পোঁছইনি। এরা দুজন একই সঙ্গে কোথাও যেতে পারে বলে কী আপনার মনে হয় ?

—মে বী. কিন্তু সামান্য হিন্ট্স্ আমি পাব না তাই বা কেমন করে হয় ?

—চয়নের সঙ্গে আপনার লাস্ট দেখা কবে ?

—ওয়ান উইক এগো।

—কোন অ্যাবনরম্যালিটি ?

—অ্যাবনরম্যালিটি মীন্স্ ?

—স্বভাবে কোন পরিবর্তন ?

এ প্রশ্নে বর্ষা হঠাৎ চুপ করে গেল। তারপর নিজের মনে কিছু ভাবতে ভাবতে বলল, সামান্য একটা ছোট খাটো ত্রুটি আমার চোখে পড়েছিল। যেটাকে একটা ছোট্ট খটকাও বলতে পারেন।

—কী রকম ?

—কদিন যাবৎ কেমন যেন অ্যাবসেণ্ট্ মাইণ্ডেড হয়ে গিয়েছিল। চয়ন বরাবরই উচ্ছল। হাসি খুশীতে মেতে থাকতে ভালবাসতো। কিন্তু কদিন

যাবৎ লক্ষ করতাম, আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে কোথাও যেন হারিয়ে যেত। মনে হ'ত হি ওয়াজ ডিপ্‌লি থিংকিং ওভার সাম আদার প্রবলেমস।

—কিছু এক্সপ্রেস করেনি।

—না। এড়িয়ে গেছে।

—ওয়েল ম্যাডাম। আজ আমরা উঠি। চয়নের কোন খবর পেলে আমাকে জানাবেন। কার্ডে আমার ফোন নাম্বার রইল। ও হ্যাঁ, বাড়িতে তো আপনি একা। আপনার বাবা মা ?

—ড্যাড সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ব্যবসা নিয়েই ব্যস্ত। আমাকে বা মাম্মিকে সময় দেবার সময়ই তার নেই। তাই মাম্মি বিকেল আর সন্ধ্যে কাটান হয় ক্লাবে, নয়তো মার্কেটিং-এ।

—আপনাদের কিসের ব্যবসা ?

—নাথিং রিমার্কেবল। ইস্টার্ন জোনে পলিপ্যাকের র'মেটিরিয়ালস্ ম্যানুফ্যাকচার করেন আমার ড্যাড।

আর কিছু বুঝুক না বুঝুক দীপু এটা বুঝল পার্টি মালদার। রাস্তায় নেমে ও বলল, এই জন্যেই শালা আমি বড়লোকদের বাড়ি যেতে চাই না।

—কেন ? তুই তো বর্ষাকে দেখতে চেয়েছিলি।

—রক্ষে কর গুরু। এই সব ট্যাঁস মার্কা বড় লোকের আদুরি মেয়েদের আমার একেবারেই ভালো লাগে না। একটা সেনটেন্সে নিদেন পক্ষে ছটা করে ইংরেজী পাও। কেন রে শালা, আমরা কী বাংলা বুঝি না নাকি তুই বাংলা বলতে পারিস না ? গুরু, একটা কথা শুনে রাখ, ও মেয়ে যতই প্রেমের কাঁদুনী গাক, এক নম্বরের চড়ানে মেয়ে। বহু ছেলেকে ঢপিং করে ঘুরে বেড়ায়। ভালবাসার এরা কচু বোঝে। আমার কী মনে হয় জান, এই সব পাগলী টাইপের মেয়েরা খুব জুতের হয় না। তুমি কী ভাবছ অর্জুনকে ও নাচায়নি। আমি তো শালা কিছুক্ষণ মাত্র দেখেছি। কথা বলার ঢং ঢাং দেখে আমিই তো উইক হ'য়ে পড়েছিলাম।

—তোর ভ্যানভ্যানানি থামাবি !

—যথা আজ্ঞা গুরু।

* * *

কিন্তু বেশীক্ষণ লাগল না। বাড়ি ফিরে বসা মাত্রই পুলিশ অফিসার বিকাশ তালুকদারের ফোন, আবার কেলো হয়েছে,• বুঝলেন ব্যানার্জি সাহেব।

অর্ধদগ্ধ সিগারেটটা অ্যাশট্রের মধ্যে গুঁজতে গুঁজতে নীল জিজ্ঞাসা করল,

—কেলো মানে ?

—কেলেঙ্কারী। এই মাত্র সংবাদ পেলাম সার্কুলার রোড আর পার্ক স্ট্রীট ক্রশিং-এ একটা কবরখানা আছে। সেখানে এক অজ্ঞাত পরিচয়ের যুবকের ডেথবডি পাওয়া গেছে।

—কোথায় বললেন? কবরখানায়?

—হ্যাঁ। মিসেস হেনরিয়েটা নামে একজনের কবরের ধারে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে।

—আপনি গিয়েছিলেন?

—সেখান থেকেই আসছি। বডি পোস্ট মর্টমে পাঠানো হয়েছে।

—কত বয়েস অনুমান করছেন?

—একুশ বাইশের মতো হবে।

—বডি সনাক্ত করার জন্যে কী কেউ এসেছিলেন?

—না, এটা এখনও খবরের কাগজের দপ্তরে নিয়ে পেঁছিয়নি। অবশ্য এখুনিই তা করতে হবে।

—আমি গেলে বডিটা একবার দেখতে পাব?

—আপনাকে আটকাবে কে? কিন্তু ব্যাপারটা কী বলুনতো?

—ডিটেলস্ আমি পরে জানাব। তবে ঠিক ঐ বয়েসের একটি ছেলের বডি আমি খুঁজছি।

—আপনার কোন রিলেটিভ নাকি?

—না। তবে আমার অগ্রজপ্রতিম সাগর মুখার্জি'র ছেলে আজ দিন পাঁচেক নিরুদ্দেশ। এনিওয়ে, আপনাকে সঙ্গে নিয়ে আমি একবার পুলিশ মর্গে এবং অন দ্য স্পটে যেতে চাই।

—স্পটে যাবেন? মানে কবরখানায়?

—হ্যাঁ। যদিও আজ রাতেই যাওয়া উচিত। কারণ আমার একদিনের লেটে যাওয়া মানে অনেক কিছু সূত্র হাত থেকে ফস্কে যেতে পারে।

—ঠিক আছে ভোর ভোরই আপনি লালবাজারে চলে আসুন। ওখান থেকে আমরা একসঙ্গেই যাব।

* * *

ছ সাত দিনেই বডি বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে মুখের চেহারা কদাকার। আজকের কাগজেও বেরিয়েছে সার্কুলার রোডের নিকটবর্তী কবরখানায় অজ্ঞাত পরিচয়ের এক যুবকের মৃতদেহ পাওয়া গেছে। তার কপালে গভীর ক্ষতের চিহ্ন। সম্ভবত তাকে ক্লোজরেঞ্জ থেকে গুলি করে মারা হয়েছে। মৃতের বয়েস আনুমানিক একুশ বাইশ। ইত্যাদি···।

নীল কপালের দিকে নজর দিল। হ্যাঁ গুলিই করা হয়েছে। যদিও বিকৃত মুখখানি এতই বিশ্রিভাবে ফুলে গিয়েছিল যে ক্ষত চিহ্নও ক্রমশ আশ

পাশের মাংস চাপে বুজে আসছিল। কোন রক্তের রেখাও ছিল না। এখন বর্ষাকাল। মাঝে মাঝেই প্রচণ্ড বেগে বৃষ্টি হয়ে গেছে গত এক সপ্তাহে।

পকেট থেকে ছবিটা বার করল নীল। হ্যাঁ চয়নের মুখের আদল তো আছেই। বিশেষ করে চুলের স্টাইল। চয়নের মাথায় ঘন কোঁচকানো চুল। বৃষ্টি আর কাদায় খানিকটা এলোমেলো। শরীর সাদা চাদরে ঢাকা থাকায় নীচের অংশ দেখা যাচ্ছিল না। তবুও নীলের অভিজ্ঞ চোখ একবার দেখেই বলে দিল এটা অর্জুনের বডি নয়।

নাকে ঠেসে রুমাল চেপে পাশে দাঁড়িয়ে ছিল দীপু। কোন রকমে ও বলতে পারল, চল গুবু, এ নরকের গন্ধ অন্নপ্রাশনের ভাত তুলে আনবে। বোঝাই যাচ্ছে তোমার সাগরদার কপাল ফেটেছে। চল, চল।

সত্যিই আর দাঁড়ানো যাচ্ছিল না। ওরা বেরিয়ে এল।

—তোমার সাগরদাকে ফোন করবে নাকি ?

—নাহ্, ঐ নিষ্ঠুর সংবাদটা পুলিশই দেবে। বরং তালুকদারকে একটা ফোন করে সাগরদার বাড়ির ঠিকানাটা জানিয়ে দিই।

কাছাকাছি এস টি ডি বুথ থেকে ফোন করে বেরিয়ে এসে নীল বলল, এখনই একবার পার্ক সার্কাস কবরখানায় যেতে হবে।

—তা নয় গেলে, কিন্তু একটা ব্যাপার আমার মাথায় ঢুকছে না। মিনিমাম ছ'দিন ওখানে বডিটা পড়েছিল। তা এই ছ'দিনে কোন সাহেব মরেনি।

—হ্যাঁ, প্রশ্নটা আমারও। কেন এতদিন বডিটা কারো নজরে এল না ? সেই জন্যেই আরো বেশী করে জায়গাটা তন্নতন্ন করে দেখার দরকার।

—ওকে বস্। লেট আস মার্চ টু পার্কসার্কাস গ্রেভিয়ারড্।

ওরা যখন কবরখানায় এসে পৌঁছল তখন প্রায় বেলা সাড়ে এগারোটা। কাঠের রেলিং দরজা ঠেলে ওরা ভেতরে গিয়ে দাঁড়াল। চারদিকে সবুজের সমাহার। অদ্ভুত শান্ত নীরবতা ছড়িয়ে রয়েছে। সার সার সমাধিবেদী। নিমেষে পটপরিবর্তন। কবরখানার বাইরে ট্রাম বাস লরি আর মোটরের যান্ত্রিক গোলযোগ। সঙ্গে অসংখ্য মানুষের কোলাহল। অথচ মাত্র একটি ইটের দেওয়ালের এপাশে শান্ত নির্জন পবিত্রতা।

নীল আর দীপু কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। এমন সময় একজন প্রৌঢ় সম্ভবত কেয়ার টেকার নীলের কাছে এসে জিজ্ঞাসু মুখে দাঁড়াল।

—ভাইসাব, কাল হিঁয়াসে এক ডেডবডি মিলা থা। পুলিশ উয়ো বডি লেগিয়া। লেকিন হাম উয়ো স্পট্ মে যানে চাতা।

—ম্যায়নে পুলিশকো খবর ভেজা থা। আপ কেয়া পুলিশসে আরাহা হ্যায় ?

—জিহাঁ।

—তো ইয়ে লাইনসে একদম সিধা চলা যাইয়ে। একদম এণ্ডমে মিসেস হেনরিয়েট কী গ্রেভ ষিধার হ্যায় হুঁয়াই।

—ঠিক হ্যায়।

ওরা এগিয়ে যায়। দীপু বলে, গুরু, তুমি মাইরি রাষ্ট্রভাষাটা কবে ছাড়বে বলতো? ওটা তোমার ঠিক আসে না।

—চুপ কর। ভাষার দরকার হয় কেন? মনের কথা আদান প্রদানের জন্যে। তা সেটা তো হয়েছে। তবে আর চিন্তা করার কী আছে? তবে খুব একটা আনাড়ি হিন্দি বলিনি।

নিজের ফাটা ঢাক নিজেই পেটাও। আমার কী?

মিসেস হেনরিয়েটার সমাধিবেদীটা ছিল একেবারে শেষের সারিতে। তারও ওপাশে খানিকটা ঘাস জঙ্গল। বুনো গাছগাছালি। আগাছা আর নোংরা কিছু পরিত্যক্ত বিবর্ণপ্রায় জামাকাপড়ের শেষাংশ এলোমেলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। কয়েকটা বিশাল বিশাল নিম বট আমেরা শাখা প্রশাখা বিছিয়ে নিজেদের মধ্যে সহাবস্থান করে আছে।

জায়গাটা ভালো করে দেখতে দেখতে নীল বলল, আইডিয়াল প্লেস।

— হ্যাঁ, কবর দেওয়া তো?

— সে তো বটেই। তবে নিশাচর বা নেশাখোরদের কাছেও।

—এ কথা কেন বলছ?

—এখন সবে বারোটা বাজে। কিন্তু আকাশে ঘন মেঘ থাকায় এরি মধ্যে জায়গাটা কেমন অন্ধকার অন্ধকার। থমথমে। তাই না?

—হ্যাঁ তাই।

—এই জায়গাটাই সন্ধ্যের পর বা গভীর রাতে কী চেহারা নেবে?

—শয়তানের আখড়া। কিন্তু তারা এখানে আসবে কী করে? গেটের মুখে কেয়ার টেকার আছে। চারপাশে উঁচু পাঁচিল।

—আইন যেমন আছে, আইনের ফাঁকও আছে। বেড়া আছে বেড়া টপকাবার রাস্তাও নিশ্চই আছে।

মিসেস হেনরিয়েটার সমাধির পাশটা ভাল করে লক্ষ করছিল নীল। একটা জায়গার ঘাস থেৎলে আছে। এদিক ওদিক কয়েকটা সিগারেটের টুকরো। কিছু ভাঙ্গা মদের চ্যাপ্টা বোতল। আর একটু এগিয়ে যেতেই পাওয়া গেল আস্ত গাঁজার কল্কে। সেগুলি দেখতে দেখতে নীল বলল, কিছু বুঝছিস দীপু?

—হ্যাঁ। আসর বসার নমুনা।

—বিশেষ করে গাঁজার কল্কেটা। খুব পুরনো নয়।

—রোজই তো বৃষ্টি হচ্ছে। হয়তো তাই গায়ে ময়লা টয়লা ধরেনি।

—হ'তে পারে। কিন্তু কলকাতা শহরে এতো জায়গা থাকতে বেছে বেছে এই জায়গাতেই চয়নকে খুন করা হ'ল কেন? তবে কী চয়নও নেশা করতো?

—তাও হ'তে পারে। আর নেশাটেশা করেই তো খুন জখম করার প্রবণতা বাড়ে। কিন্তু নীলদা, এ খুনের কারণ কী? আই মীন মোটিভ?

—কিছু বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু অর্জুন কোথায়? তাকে পেলেও খানিকটা রহস্য কাটতো।

—আচ্ছা অর্জুন খুন করেনি তো! ওদের দুজনের মধ্যে যথেষ্ট ভাবটাব ছিল। কোন অজুহাতে চয়নকে এখানে নিয়ে এসে মার্ডার করে তারপর দেশ ছেড়ে ভাগলবা।

—তোর কথা একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছি না। কারণ এক্ষেত্রে মার্ডার করাটা মোটিভের দিক থেকে প্রচণ্ড জোরদার। কাজটা করাও ওর পক্ষে সব থেকে সহজ। এবং ওর নিরুদ্দিষ্ট হওয়াটাই ওর দিকে সন্দেহের পাল্লা ভারী করে দিচ্ছে।

কিন্তু রিভলবার পাবে কোত্থেকে?

—পিস্তল বা রিভলবার বা ওয়ান শটার পাওয়া কোন শক্ত ব্যাপারই নয়। যে কেউ কিছু টাকা ফেললেই পেয়ে যাবে।

— তাহলে এখন আমাদের কাজ কী?

—অর্জুনকে ইমিডিয়েট খুঁজে পাওয়া দরকার। ও কলেজ পড়ুয়া ছেলে। কলকাতা শহরে নিশ্চই চয়ন আর বর্ষা ছাড়া ওর অন্য বন্ধু নেই এমন হতে পারে না। তাদেরই একজনকে ধরতে হবে। আর এ ব্যাপারে বর্ষাই পারে আমাদের সাহায্য করতে। ঠিক আছে, আপাতত বাড়ি ফেরা যাক। তবে একটা কাঁটা এখনও খচ্‌খচ্‌ করছে।

—কী?

—নিদেন পক্ষে পাঁচদিন বডিটা এখানে পড়েছিল। অথচ সেটা কেন কারো নজরে এলো না! এমন কী কেয়ার টেকারও কোন খোঁজ রাখল না। হোয়াই! পাঁচদিনের ডিকম্পোজ্‌ড্‌ বডি! গন্ধ পাওয়াটাই স্বাভাবিক।

—কেয়ার টেকারকে একবার ঝাঁকাবে নাকি? তবে দোহাই তুমি রাষ্ট্রভাষা প্রয়োগ কোরনা।

কেয়ারটেকারকে পাওয়া গেল সেই গেটের মুখেই। লোকটা ঝিমুচ্ছিল। বয়স পঞ্চাশ পঞ্চান্নর মধ্যেই। খাকি হাফশার্ট আর দোমড়ানো মোচকানো একটা প্যাণ্ট। মুখে না কামানো তিনচার দিনের কাঁচাপাকা দাড়ি।

—আপনার নাম কী?

বলেই নীল আড়চোখে দীপুর দিকে তাকিয়ে বুঝিয়ে দিন ওর আপত্তি সে মেনে নিয়েছে।

নীলের ডাকে লোকটার তন্দ্রাছুট্। চোখ রগড়ে বলল, জী. ইউসুফ।

—আপনি এখানে কতদিন কাজ করছেন?

—তা ধোরেন বিশ বছর হোয়ে গেল।

—আপনার কী চব্বিশ ঘণ্টার ডিউটি?

—নেহি সাব। টমাস ভি আছে। হামার ডিউটি খতম হ'লে উ এসে যাবে।

—এখন আপনার ডিউটি চলছে?

—নেহি। রাত বারাসে দিন বারাতক মেরা কাম।

—কিন্তু এখন তো বারোটা বেজে গেছে। টমাস কোথায়?

—উ শালে লোকগা বাত্ ছোড়িয়ে। দারুউরু পিকর কিধার লেট গিয়া।

—আগর উলোক নেহি আনেসে, বলেই নীল থেমে গেল। পরিমার্জিত বাংলায় বলল, টমাস না এলে আপনি কী করবেন?

—কেয়া করেগা, হামকোই রহেনে পড়েগা। উধার রেজিস্টারবাবু ভি হ্যায়।

—আচ্ছা ইউসুফভাই, ওখানে একটা ডেডবডি প্রায় দিন পাঁচেক পড়ে ছিল। পচা গন্ধও ছাড়ছিল। তা একদিন আপনার নজরে আসেনি কেন?

—হামলোগ উধার যাতাই নেহি। যব বদ্বু নিকালা তব গিয়া।

— কেন?

—জিন হ্যায় না!

—জিন? মানে ভূত?

—জি হ্যাঁ ভূত। হর রাতমে উধার ভূত আতা হ্যায়। উসি লিয়ে কোই ভি উধার যাতা নেহি।

— প্রত্যেকদিন ভূত আসে?

— চায় তো আপ ভি দেখ সেকতে।

—কটা ভূত আসে?

—ক্যা মালুম।

—আপনি নিজে কোনদিন দেখেছেন?

—নেহি সাব। মেরেকো কোই পসন্দ নেহি, ভূতসে মেরা বহুত ডর।

—তাহলে জানলেন কী করে ভূত আসে?

— টমাস দেখা হ্যায়।

—হুঁ, বলে নীল আর দীপু বেরিয়ে এল।

- রেজিস্টারকে একবার বাজালে হোত না?

—কী হবে? ঝামেলার মধ্যে কেউই যেতে চাইবে না।

রাস্তায় এসে দীপু বলল, ভূত দেখতে আসবে তো? এমন সুযোগ কিন্তু আর পাবে না।

—আসতেই হবে।

* * *

বাড়ি ফিরতেই ওদের একটু অবাক হ'তে হ'ল। ড্রইংরুমের শোফায় মাথায় হাত রেখে বসে আছে বর্ষা। নীলকে দেখেই ও উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল। নীল বাধা দিল।

—আরে না না, আপনি বসুন।

সম্ভবত বর্ষা খুবই কান্নাকাটি করেছে। সেটা ওর চোখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। আজ আর কোন সাজটাজের বালাই নেই। রুক্ষ্ম উস্কো খুস্কো চুল।

—তাহলে আপনি সবই শুনেছেন!

ধরা ধরা গলায় বর্ষা বলল, আমি এখনও ভাবতে পারছি না চয়ন আর নেই। হোয়াট্‌স্‌ আ ব্রুটাল ডেথ!

আবার মাথা নীচু করে ও ফোঁপাতে শুরু করল।

—মিস্‌ মজুমদার।

সামান্য সহানুভূতির ডাকে বর্ষা একেবারেই ভেঙ্গে পড়ল। এবার বেশ শব্দ করেই শরীর কাঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। নীল একটু সময় নিল। ঠিক এই মুহূর্তে কিছু বলতে যাওয়া মানেই বর্ষাকে আরও কাঁদার ইন্ধন জোগানো। মিনিট দুয়েকের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে বর্ষা বলল, স্যারি দাদা, আমি একটা সীন তৈরী করে ফেললাম। স্যরি।

এই প্রথম একটি বাঙালি আট পৌরে মেয়ের চেহারা দেখা দিল। ধীরে ধীরে নীল বলল, বর্ষা তুমি আমাকে দাদা বললে, তাই তোমাকে তুমি করেই ডাকছি।

—হ্যাঁ, সেটাই তো ঠিক। কিন্তু, আমি এখন কী করব?

—নিজেকে শান্ত করতে হবে। মৃত্যু যে মানুষের জীবনে অবধারিত সত্য।

—আই নো, আই নো দাদা। বাট

—বাট?

—মাই পজিশান ইজ অ্যাট স্টেক। আয়াভ কনসিভড্‌ হিজ বেবি।

—হোয়াট, চমকে ওঠে নীল, ইজ ইট ফ্যাক্ট?

—এ ব্যাপারে কোন মেয়েই কী মিথ্যে বলবে যদি না তার অন্য কোন ইনটারেস্ট থাকে?

খানিকক্ষণ গুম হয়ে থাকার পর নীল বলে, কিন্তু আইনত তো তোমরা ম্যারেড নও।

সেদিন তো তাই বললে।

—সেদিন যে বলার দরকার ছিল না। কিন্তু আজ বলতে হচ্ছে। ইয়েস, উই আর ম্যারেড। লাস্ট-মাংহ এ আমাদের রেজিস্ট্রি হয়ে গেছে।

—সাগরদা, আই মীন চয়নের বাবা বা মা এসব কিছু জানেন ?

—না, আমরা ভেবেছিলাম দু এক দিনের মধ্যেই ওঁদের জানাব। চয়নের অ্যাবসেন্সের জন্যেই ব্যাপারটা কাউকেই বলা হয়নি। আমার বাড়িতেও কেউ কিছু জানেনা। এখন বলুন দাদা আমি করব ?

নীল একটা সিগারেট ধরিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। আসলে সে ভাবতে চাইছিল চয়নের হত্যাকারীকে খুঁজে বার করা প্রথম কাজ না বর্ষার অ্যাকিউট সমস্যা মেটানো আগের কাজ! ব্যাপারটা হাল্কা ভাবে নিলে অথবা বর্ষাকে যে ধরনের মেয়ে বলে প্রথমে মনে হয়েছিল ঠিক সেই ধরনের মেয়ে হলে সে বলে দিতে পারতো বর্ষার উচিত এখনই অ্যাবরসান করা। কিন্তু এই মুহূর্তের বর্ষার সঙ্গে আগের বর্ষার অনেক পার্থক্য। এখন সে এক বিপন্না টিপিক্যাল হিন্দু নারী। তবু নীলকে একটু কঠোর হতেই হ'ল।

ব্যাপারটা কী অন্য ভাবে ভাবা যায় না ?

- কী রকম ?

—এই সন্তান যদি পৃথিবীতে না আসে ?

—এ আপনি কী বলছেন ?

—ডোণ্ট বী সেণ্টিমেণ্টাল। চয়ন নেই এটা চরম সত্য। তার স্মৃতির রেশ নিয়ে দীর্ঘদিন অবসাদে থাকা এক জিনিষ কিন্তু সেই স্মৃতি যদি তথাকথিত সমাজের কাছে তোমাকে নিত্যদিন নানা মানুষের শ্লেষের চাবুক মারে তা কী তুমি সহ্য করতে পারবে ?

—জানিনা। আমি কিছু ভাবতেও পারছি না।

—তোমরা আজকের দিনের ছেলেমেয়ে হ'য়ে কী ভাবে যে এই সিলি মিসটেক কর বুঝিনা। তুমি কোন ডাক্তারকে মীট করেছিলে ?

—নো। নট অ্যাটল। কী জানি কেন, প্রথমদিনই আপনাকে দেখে মনে মনে একটা রেসপেক্ট তৈরী হয়ে গিয়েছিল। একটা বিশ্বাস এসেছিল চয়নকে নিশ্চই আপনি খুঁজে বের করবেন। কিন্তু যখন সেই ভয়ংকর নিউজটা এল, বিশ্বাস করুন একমাত্র আপনার কথাই মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল আপনাকে বিলিভ করা যায়। কেন ? এ প্রশ্নের উত্তর আমার আমার জানা নেই।

—তুমি আমাকে বড় কঠিন সমস্যায় ফেলে দিলে। তবু বলব, ক্রুড রিয়ালিটির কথা ভেবে বলতে পারি তুমি অ্যাবরসানের কথাটা মাথা থেকে ওয়াসআউট করে দিও না। এমন কী তুমি যদি বল তাহলে আমি এখনই ব্যবস্থা করতে পারি। অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব কিন্তু বিশাল বোঝা।

—মজার কথা কী জানেন দাদা, আমার একজন বিশেষ বান্ধবী কাম দিদি আছেন যিনি এ শহরের একজন নামকরা লেডি গাইনী। নো বডি উইল নো ইফ আই কনভেস এভরিথিং টু হার। অ্যান্ড সী উইল ডু দ্য নীড ফুল। বাট আই নেভার থট অব হার। অ্যাবরসানের কথা আমি টিল নাউ ভাবতেও পাচ্ছি না।

—তবু বলছি তুমি একটু ভাব। এবং আমিও ভাবব। বাট,

—বাট ?

—তোমার চয়নের হত্যাকারী আইনের সাজা পাক। এটা নিশ্চই তোমার কাম্য ?

—সিওর। ইফ আই উড গেট হিম অর হার ইন দিস মোমেন্ট, আই উইল কিল হিম ডেফিনিট্‌লি।

—না। সে কাজটা তোমায় করতে হবে না। ওটা আমার হাতেই ছেড়ে দাও। তাকে আমি খুঁজে বার করবই। কিন্তু তার আগে আমাকে কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দাও।

—আই শ্যাল ট্রাই মাই বেস্ট টু আনসার ইউ।

—অর্জুনকে কী তুমি সন্দেহ কর ?

—হোয়াই ?

—জেলাসি। অর্জুন তোমাকে ভালবাসতো। অ্যাটলীস্ট তার একটা সফ্‌ট্‌ কর্নার ছিল। কিন্তু চয়ন তোমাকে জয় করে নিল।

—নো, আই ডোন্ট বিলিভ ইট। একদিন বলেছি, অর্জুন ইজ মাই গুড ফ্রেন্ড। আমার কোন ক্ষতি হবে সেটা অর্জুনের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। আর চয়নকে খুন করা অনেক দূরের কথা, প্রয়োজনে চয়নের জন্যে নিজের জীবনটাও দিয়ে দিতে পারে।

—এগুলো ভাবালুতার কথা বর্ষা। প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ড্‌টা একটু অন্য রকম। তবু তোমার কথা মেনে নিয়েই বলছি, হোয়্যার ইজ অর্জুন ? ডু ইউ নো ?

—বিলিভ মী, আই ডোন্ট নো। আচ্ছা, অর্জুনকে কেউ চয়নের মতো শেষ করে দেয়নি তো ?

—তার মানে আমাদের ধরে নিতে হবে ওদের দুজনের কোন কমন এনিমি আছে।

—এনিমি ? অর্জুনের থাকতে পারে। ও কখনও ফেরোসাস কখনও মরবিড। তবে স্পষ্ট বক্তা। উচিত কথা বলতে কখনো পিছিয়ে যায় না। হয়তো সেই আক্রোশে কেউ ওকে মার্ডার করতে পারে। বাট চয়ন ওয়াজ ভেরী পপুলার গাই টু এভরিওয়ান।

নীল একটু হাসল। এ মেয়েটা জানেনা পৃথিবীতে কে যে কখন কার শত্রু হয়ে যায় সেটা সে নিজেই জানতে পারে না। নীল অন্য প্রসঙ্গে গেল, তোমার এই কর্নাসিভ্ করার ব্যাপারটা এবং রেজিষ্ট্রির ব্যাপারটা আর কে কে জানে ?

—অর্জুন সব কিছুই জানতো।

—আর কেউ ?

—না।

—অর্জুন কী কাউকে বলে থাকতে পারে বলে মনে হয় ?

—আয়াম ডেড সিওর. অর্জুনের পেট থেকে কথা বার করা খুব শক্ত। অত্যন্ত রিজাভর্ড। জাস্ট চয়নের রিভার্স ক্যারেকটার।

—তাহলে চয়ন কী কাউকে বলেছিল ?

—আই ডোণ্ট থিঙ্ক সো। কারণ ওর সব গোপন এবং ব্যক্তিগত কথা ও জানাতো ওর মাকে। হি ওয়াজ ভেরী পেট টু হিজ মাদার। মাসীমাই যখন জানেন না তখন কী করে বলি সে অন্য কাউকে কিছু বলেছিল।

অর্জুনের কয়েকটা বন্ধুর নাম দিতে পার ?

ঠোঁট চেপে সামান্য সময় কিছু ভেবে বর্ষা বলল, আগেই বলেছি অর্জুন কম কথা বলা খুব রিজাভর্ড ছেলে। তাই ওর বন্ধুর সংখ্যাও খুব কম। তবে একটি ছেলের নাম এই মুহূর্তে মনে পড়ল। প্রায়ই ওর সঙ্গে অর্জুনকে দেখা যেতো।

—হু ইজ দ্যাট চ্যাপ ?

—আমাদেরই ক্লাশ মেট। নাম অভিনন্দন ব্যানার্জি। প্রোটোটাইপ অব অর্জুন। ভেরী সিরিয়াস অ্যাণ্ড ভেরী ইনট্রোভার্ট।

—তার বাড়ির ঠিকানাটা পাওয়া যাবে ?

—আমার কাছে নেই। তবে খুব প্রবলেমও হবে না। আই উইল কালেক্ট ইট ফ্রম কলেজ রেজিস্টার।

—তোমার সঙ্গে অভিনন্দনের আলাপ আছে ?

—জাস্ট অ্যাজ আ ক্লাশ মেট। বাট নো ইনটিমেসি।

—ওয়েল, তুমি তোমার কলেজের ঠিকানাটা দাও। একান্তই যদি তোমার এই মানসিক ডিপ্রেসানের জন্যে না পার, তাহলে তোমার কলেজ থেকে আমিই কালেক্ট করে নিতে পারব।

—অ্যাজ ইউ লাইক দাদা।

—ঠিক আছে। আমিই কালেক্ট করে নোব। নাম বললে, অভিনন্দন ব্যানার্জি। ওয়েল, আজ এখন তুমি বাড়ি যাও। বী প্র্যাকটিক্যাল। আর ঐ ব্যাপারে তুমি ভেবে যা ঠিক করবে সেটাই হবে। চয়নের বাড়ি গিয়েছিলে ?

—না, আমি আর কোথাও যাব না। যেতে পারব না। দাদা, আপনি ওর খুনীকে ধরার ব্যবস্থা করুন। টাকাকড়ির জন্যে আপনি চিন্তা করবেন না। যা খরচ হবে সব আমি দোব।

—ঠিক আছে। ওগুলো তোমার ভাবার ইস্যু নয়। তুমি তোমার প্রয়োজনীয় কর্তব্য নিয়ে চিন্তা কর। চয়ন অ্যাণ্ড অর্জুন ইজ মাই হেডেক।

বর্ষা চলে যাবার পর নীল বিকাশ তালুকদারকে ফোন করল। ওপাশ থেকে বিকাশের কণ্ঠ স্বর ভেসে আসতেই নীল বলল,

—ভূত দেখতে চান নাকি তালুকদার সাহেব?

—আপনি যে রসিক পুরুষ তা আমার জানা ছিল না ব্যানার্জি সাহেব।

—ঠাটা নয়। সিরিয়াসলি বলছি।

তাহলে ভূত দেখবো কেন? আগে ভগবানের দেখাটা পেয়ে নিই।

ভগবান বড় কঠিন ঠাঁই। সেই ভদ্রলোককে কেউ চোখে দেখেনি। তবু তাঁর অস্তিত্বকে বড় একটা কেউ উড়িয়ে দিতে পারে না। তবে ভূতপ্রেত-গুলোর কোন পেডিগ্রি নেই। যাকে তাকে দেখা দিয়ে সংকট বাড়িয়ে দেয়।

—তাই বলুন, সংকটে পড়ে ভূতের নামে অন্য কিছু পেতে চাইছেন?

—ইউ আর রাইট, তবে সংকট আমি কখনও কাউকে শেয়ার করি না। লড়াই করে সংকটকে হটিয়ে দিতে পারলেই আমার আনন্দ। সংকটের প্রশ্ন নয়। প্রশ্নটা হল নড়াচড়াওয়ালা কিছু ভূতের সন্ধান পেয়েছি। যাবেন কিনা জিজ্ঞাসা করছি?

—কজন কনস্টেবল নিতে হবে?

—আপাতত জনা পাঁচেক উইথ আর্ম।

—ওকে,

—আমি জানিয়ে দোব। যে কোন মুহূর্তেই ডাকতে পারি। তবে সেটা হবে গভীর রাতে।

—গুড। আমি তৈরী থাকব।

—চয়ন মার্ডারের পিএম রিপোর্ট কী বলছে? স্টম্যাকে কোন নেশার বস্তুর সন্ধান পাওয়া গেছে কী?

—না। নির্ভেজাল স্টম্যাক। মৃত্যু ঘটেছে অধিক রাতে। পিস্তলের গুলিই তার মৃত্যুর একমাত্র কারণ। এবং সেটা খুবই ক্লোজ রেঞ্জ থেকে।

—ঠিক আছে, এখন রাখছি।

ইতিমধ্যে দীপু এসে গিয়েছিল। সে দিদির বাড়ি থেকে ভাতভাত খেয়ে এসেছে। ওর একটা ব্যাধি আছে। ভরপেট খেলেই ঘুম পায়। সোফায় বসে সেই তালই করছিল।

—নো ব্রাদার। আজ দুপুরের ঘুমটা বাদ দিতে হচ্ছে। এই মুহূর্তে

তোমাকে একবার বেরুতে হবে। বর্ষার কলেজে যেতে হবে। ওখানে অভিনন্দন ব্যানার্জি নামের একটি ছেলের বাড়ির ঠিকানা এবং হোয়্যার অ্যাবউটস জোগাড় করতে হবে।

—কনগ্র্যাচুলেশন ব্যানার্জি? নামের কী ছ্যাবনা মাইরি। সাহেবরা এসব নাম কল্পনাই করতে পারবে না। ঠিকানা পেয়ে তোমাকে ফোন করব।

—তাই করিস। আমি ততক্ষণে চান খাওয়া শেষ করে নিই।

* * *

ঠিক যতটা ভাবা গিয়েছিল ততটা নয়। অভিনন্দন ছেলেটা একটু চাপা। কথাবার্তা খুবই মার্জিত কিন্তু অস্পষ্ট বা দুর্বোধ্য নয়। নীলের একটি প্রশ্নে ও জানাল, অর্জুন আগে খুব উচ্ছল এবং খোলা মেলা স্বভাবের ছিল। কিন্তু অল্প বয়েসে ওর বাবা হঠাৎ মারা যাবার পর একটা মরবিড ব্যাপার ওকে চেপে ধরেছিল। হৈ হৈ করা স্বভাবটা দিন দিন মিইয়ে গিয়ে ফিরে এসেছিল একটা রাশভারি গাম্ভীর্য। কিন্তু হঠাৎ ওর ভাল লেগে যায় বর্ষাকে। এবং বর্ষার অজান্তে ও বর্ষাকে ভালবেসে ফেলে গভীরভাবে। কিন্তু,

অভিনন্দন আচমকা থাকতেই নীল প্রশ্ন করে, চয়ন এসে বোধ হয় সব কিছু ওলট পালট করে দেয়?

—না মিস্টার ব্যানার্জি, এক্ষেত্রে আমি চয়নের কোন দোষ দোব না। কারণ চয়ন আর অর্জুন বুজম ফ্রেন্ড হলেও দুজনের কেউই জানতো না যে তারা একই মেয়েকে দুজনে ভালবাসে। এক্ষেত্রে বর্ষারও কোন দোষ নেই। কারণ চয়ন আর বর্ষার মধ্যে যে একটা অ্যাফেয়ার্স তৈরী হয়েছে বা হচ্ছিল, সেটা আভাষে ইঙ্গিতে অনেকের চোখেই ধরা পড়েছিল।

—তারপর?

—তারপর হঠাৎ অর্জুনকে দেখলাম ওর আচমকা ফিরে আসা হাসিটাসি-গুলো ফুটো বেলুনের মতো আস্তে আস্তে চুপসে গেল। আফটার অল, অর্জুন আমার স্কুল ফ্রেন্ড। ওকে আমি অনেকবার অনেকভাবে স্টাডি করার সুযোগ পেয়েছি। যে অর্জুন জীবনে কোনদিনও একটা সিগারেট পর্যন্ত ছোঁয়নি, হঠাৎ একদিন সে মদ খেয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। জিগ্যেস করেছিলাম অনেক কিছু, উত্তরে জানিয়েছিল আমার বড়ো কাছের বন্ধুর কাছে আমি হেরে গেলাম রে।

ওকে ধাক্কা দিয়ে জাগাবার জন্যে বলেছিলাম, একটা মেয়ের জন্যে তুই দেবদাস হ'য়ে যাবি?

উত্তরে ও বলেছিল, দেবদাস হবার জন্যে স্ট্যামিনার দরকার। যন্ত্রণার হুলটাকে বুকের ভেতরে গভীর করে না নিতে পারলে আকণ্ঠ মদ খাওয়ার কষ্টটা সহ্য করা যায় না।

—কিন্তু তোর বিধবা মা আছেন। বর্ষার জন্যে তুই মনে প্রাণে ক্ষত বিক্ষত পরিশ্রান্ত মা-টাকে আরো কষ্ট দিবি ?

—কষ্ট সহ্য করার অভ্যেসটা মা রপ্ত করে নিয়েছেন। যেটা আমাকে কোনদিন পেতে হয়নি। পাওয়াটা শিখিনি। সেটাই রপ্ত করায় চেষ্টা করছি।

—কিন্তু এভাবে অত্যাচার করলে তুই তো মরে যাবি।

—এ পৃথিবীতে আমার আসাটা একটা অ্যাকসিডেণ্ট। আমি জানতামও না আমাকে আসতে হচ্ছে। আমার মাও আমাকে চিনতেন না। আমিও তাঁকে চিনতাম না। তারপর কদিনের মায়া মায়া খেলা। চিরসত্যটাকে যেদিন ফেস করব তখনও আমি জানতে পারব না আমি চলে যাচ্ছি। এবং চলে যাবার পরও জানব না আমি চলে গেছি। তাহলেই বুঝছিস, আমাদের থাকা না থাকায় এই প্রিয় গ্রহটির কিছুই যায় আসে না।

মিস্টার ব্যানার্জি আমি সেদিনই বুঝেছিলাম অর্জুন আবার স্যাডিস্ট্ হয়ে উঠছে। এরপর কখনও কখনও ওর সঙ্গে দেখা হোত। কিন্তু তখন ও ড্রাগ অ্যাডিটেড। আর আমার কিছুই করার ছিল না।

হঠাৎ নীল একটা প্রশ্ন করল, তুমি কী জান চয়ন ওয়াজ ব্রুটালি মাডারর্ড্।

অভিনন্দন স্থির হয়ে কয়েকমিনিট দাঁড়িয়ে রইল। তারপর নীলের দিকে শান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, জানিনা।

—খবরের কাগজে পড়নি ?

—হয়তো চোখ এড়িয়ে গেছে।

—অর্জুনও সঙ্গে সঙ্গে নিরুদ্দেশ। তোমার কী মনে হ'তে পারে চয়নের মৃত্যু এবং অর্জুনের আত্মগোপনের মধ্যে কোন যোগসূত্র আছে ?

—কী বলতে চাইছেন আপনি ?

সরাসরি প্রশ্ন নীলের, অর্জুন কী আউট অব জেলাসী চয়নকে খুন করতে পারে ?

খানিকটা ভেবে অভিনন্দন বলল, পারে। চয়ন হ'লে বলতাম পারে না। চয়নের স্বভাব তা বলে না। তবে অর্জুন সব কিছুই করতে পারে। কারণ অর্জুনের নিজের কাছে নিজের জীবনের কোন মায়া নেই।

—অর্জুনের কোন ঠেক কী তোমার জানা আছে ?

—ঠেক মানে ড্রাগের ঠেক ?

—ইয়েস।

—সঠিক জানিনা। তবে কানে এসেছিল, কখনও মেটেবুরুজ, কখনও ট্যাংরার ওদিকে, কখনও কবরখানার পাশে ও যাতায়াত করে।

—বন্ধু হিসেবে তোমার এটা জানানো উচিত ছিল ওর মাকে।

—যে ছেলে তার মা সম্বন্ধে এত নিস্পৃহ, তার মার পক্ষে আর তাকে কোনদিনও কনট্রোলে রাখা সম্ভব নয়। তাছাড়া ইদানীং ও খুব রাফ্ টাইপ হয়ে গিয়েছিল। হয়তো ড্রাগ অ্যাডিকশানের ফলে।

* * *

কয়েকটা দাগী নেশারু ছাড়া মদ গাঁজা আর ব্রাউনসুগারের ঠেক থেকে আর কিছুই উদ্ধার হ'ল না। হবেও না। কারণ সব জায়গাতেই হাত শোঁকা শুঁকির ব্যাপার। টোট্যাল সামাজিক ক্রাইমগুলো একটা চেইনে ঘুরছে। মাস্তান পুলিশ দাদা আর মন্ত্রী। যে যার স্বার্থের বাণ্ডিল বাড়িয়ে চ'লেছে। মরছে কিছু মূর্খ নাবালক আর সদ্য সাবালকেরা। বিকাশ তালুকদারের মতো কিছু সৎ পুলিশ অফিসারের পক্ষে দু একটা নেশারু বড়জোর একেবারে নীচের তলার হাতুড়ে মস্তানকে পাকড়াও করা ছাড়া আর কোন কিছুই করা সম্ভব না। তিনি তাই-ই করলেন। কিন্তু অর্জুন নিপাত্তা।

তালুকদার চেয়েছিলেন পার্কসার্কাস বেরিয়াল গ্রাউণ্ডটাকে সাদা পোশাকের পুলিশ দিয়ে ঘিরে ফেলবেন ভূত ধরার জন্যে। নীলই বারণ করল। বিকাশকে ও ওর নিজস্ব ধারণাটাই খুলে বলল, তালুকদার সাহেব, ঘেরাও করে আপনি কিছু দাগী মাতাল বা অ্যাডিকটেড ড্রাগ ইনহেলারকে ধরতে পারবেন। তাতে লাভ কিছু হবে না। আমাদের খুঁজে পেতে হবে অর্জুনকে। আর অর্জুনকে পেলেই মনে হয় চয়ন হত্যা রহস্যের জট খুলে যেতে পারে।

—তাহলে আপনি কী করতে চান?

—আমাকে কটা দিন সময় দিন। অর্জুন যদি মরে না গিয়ে থাকে, যদি সে সত্যিই খুন না হয় অথবা চয়নের ইনটিমেট ফ্রেণ্ড হয়, তাকে একদিন না একদিন মিসেস হেনরিয়েটার কবরের আশে পাশে আসতেই হবে। ক্রিমিন্যাল ইনভেস্টিগেশানের একেবারে গোড়ার কথা। আর কথাটা প্রায়শই মিলে যায়। আমি একটা লাকট্রাই করতে চাই। এবং রাতের অন্ধকারেই।

—আপনি একলা যাবেন ঐ বিশ্রি জায়গায়?

—আমাকে তো আপনি কিছুটা চেনেন।

—হ্যাঁ মশাই, এই বয়েসেও আপনি যে কতটা ডানপিটে, তা জানতে আমার বাকী নেই। তবু, ঠিক আছে, ছদ্মবেশে আমিও থাকব। আর আমাদের বড় গোয়েন্দা দীপু বাবুতো থাকছেনই।

—অবজেকশান মী লর্ড, দীপু চেঁচিয়ে ওঠে।

—ওভাররুলড, বলে দীপুর হাত ধরে থানা থেকে বেরিয়ে আসে নীল।

* * *

একে বৃষ্টির দিন। এই ঝিরঝির, এই ঝমঝম। কালো বর্ষাতির আড়ালে প্রায় রাত নটা নাগাদ নীল আর দীপু মিসেস হেনরিয়েটার সমাধি বেদী

থেকে বেশ কিছু দূরে একটা বিশাল বটের নীচে দাঁড়িয়েছিল। একবার দীপু ফিসফিস্ করে জিগ্যেস করে, ছদ্মবেশী বিগ অফিসার এখন কোথায় ?

--জানিনা। হয়তো কোথাও এসে ঘাপটি মেরে বসে বসে মশার কামড় খাচ্ছেন।

টিপ টিপ করে সমানে বৃষ্টি হয়ে চলছিল। নিস্তব্ধ নির্জন কবরখানা। আশে পাশে আলোর কোন চিহ্ন নেই। এদিকের পাচিলের ওপাশে কর্পো-রেশনের বাতিটাও জ্বলছে না। মাঝে মাঝে কোথাও ঝিঁ ঝিঁ আর ব্যাঙের ডাক। এ সব জায়গায় সাপ থাকা বিচিত্র নয়। তার ওপর মশা তো আছেই। গালে চটাস করে একটা শব্দ তুলে দীপু বলল, মাইরী, এ যেন শালা সোনায় সোহাগা। মশা, ব্যাঙ, সাপ, বৃষ্টি, অন্ধকার। এবং জমাটি রহস্য। বলহরি হরিবোল। একটু পরে আসবে ভূত। গুরু, মাইরি চালিয়ে যাও। তোমার জবাব নেই।

যার উদ্দেশ্যে বলা সে কিন্তু নির্বিকার।

নীলের অভিযান কিন্তু ব্যর্থ হল না। সম্ভবত দীপু কোলের শিশুর মতো ঘুমে আচ্ছন্ন। কারণ ওর কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না। নীলের ঠায় দৃষ্টি নিবদ্ধ হেনরিয়েটার কবর। চয়নের মৃতদেহ ওখানেই পড়েছিল। রেডিয়াম ডায়ালের হাতঘড়ি বলছে রাত বারোটা।

হঠাৎ নীল দেখল একটা কালো ছায়ামূর্তি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে হেনরিয়েটার সমাধির দিকে। বৃষ্টি পিচ্ছিল ঘেসো জমিতে সম্ভবত পা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। নেশা করে থাকতে পারে। টলমল করতে করতে ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়াল বেদীর সামনে। নীল সজাগ। চিমটি কেটে দীপুকেও সজাগ করে দিয়েছে।

মাত্র কয়েকমিনিট পরই অভূতপূর্ব এবং আশাতীত দৃশ্য পরিবর্তন। ছায়ামূর্তি সহসাই আছড়ে পড়ল বেদীমূলে যেখানে ছিল চয়নের মৃত দেহ। নিস্তব্ধটাকে চিড়ে অস্ফুট ক্রন্দন ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল। আগন্তুক মাটিতে পড়ে গুমড়ে গুমড়ে কাঁদছে।

দীপু বলল, দূর শালা ভূত কোথায়, হেনরিয়েটার বাচ্চার শোক উথলে উঠেছে রাত দুপুরে। তার মানে ঐ প্রত্যেকদিন রাতে এখানে আসে আর কান্না ছড়ায়। লোকে ভাবে ভূতে রোদন করছে। সু···শা···লা।

নীল কিন্তু উঠে দাঁড়িয়েছে। ওর হাতে বড় টর্চ। জ্বালায়নি। খুব সন্তর্পণে সে এগিয়ে যায় ক্রন্দনরত মূর্তির দিকে। গিয়ে দাঁড়ায় ঠিক তার পাশে।

মূর্তির অস্ফুট ক্রন্দন আর বিলাপ থেকে একটা শব্দই বার বার শোনা যাচ্ছিল, চয়ন···চয়ন···একী হল চয়ন ?

নিমেষে তীব্র টর্চের আলো ছড়িয়ে পড়ে ছায়ামূর্তির মুখে। কঠোর কণ্ঠে নীল বলে, উঠে দাঁড়াও অর্জুন রায়। ইউ আর আণ্ডার অ্যারেস্ট।

ততক্ষণে একদিক থেকে দীপু অন্য দিক থেকে লুঙ্গি পরা ছাগলওলার বেশে মিস্টার তালুকদার। তাঁর হাতে উদ্যত রিভলবার।

* * *

জ্ঞান ফিরে আসার পর দু তিনদিন একটা ঘোরের মধ্যে ছিল অর্জুন। মাঝে মাঝেই সে একটা নির্দিষ্ট সময়ে চিৎকার করেছে নির্দিষ্ট ড্রাগটির জন্যে। এবং ডাক্তার নার্সের কড়া তত্ত্বাবধানে থেকে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছে। অর্জুনের মা অনেকবার ঘুরে গেছেন। এবং চয়নের হত্যাকারী হিসেবে যাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তার জবানবন্দী না পাওয়া পর্যন্ত তার কোনো নিকট আত্মীয়ের সঙ্গেও দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না। ইতিমধ্যে নীল বর্ষার সঙ্গেও দেখা করেছিল। কিন্তু বর্ষা এখন বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলাচলে। এখনও সে ভাবতে পারছে না তার প্রিয় বন্ধুই তার আইনত স্বামীকে হত্যা করেছে।

একটি সম্পূর্ণ আলাদা ঘরে রাখা হয়েছে অর্জুনকে। বিছানার ওপর ঠেস দিয়ে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। তখন প্রায় শেষ বিকেল। সূর্যের শেষ আভায় পশ্চিম দিকে সোনালি আভাষ। ঘরে ঢুকলেন বিকাশ আর নীল।

ওরা ঢুকতেই অর্জুন একবার ওদের দিকে তাকিয়ে ফের বাইরের দিকে তাকাল। তার মুখে বিষাদের কালো ছায়া। নীলই বেশ কোমল স্বরে জিজ্ঞাসা করল, কেমন আছ অর্জুন?

বিষাদগ্রস্ত মুখে কিছুটা বিরক্তি ছড়িয়ে পড়ল। সে মুখ না ফিরিয়েই বসে রইল। নীল আবার জিজ্ঞাসা করল, তুমি কিছু বলবে না?

এবার আস্তে আস্তে মুখ ফিরিয়ে একবার নীল আর একবার বিকাশের দিকে তাকিয়ে ও বলল, আমি কী জানতে পারি কেন আমায় অ্যারেস্ট করা হয়েছে?

—তোমায় তো অ্যারেস্ট করা হয়নি।

—তাহলে পুলিশের ইউনিফর্ম পরা এই ভদ্রলোক এখানে কেন?

—উনি তোমাকে কবরখানা থেকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করেছিলেন। ওঁর একটা নৈতিক দায়িত্ব আছে।

—কী জানতে চান?

—অত রাত্রে নির্জন কবরখানায় তুমি গিয়েছিলে কেন?

—যাকে আর কোনদিনও বুকে নিতে পারব না, তার শেষ শয্যার মাটিটুকু স্পর্শ করতে চেয়েছিলাম। রোজ রাতেই তো আমি ওখানে যাই।

—শুধু ঐ একটা কারণেই যেতে?

—না, আগে যেতাম নেশা করতে। পরে যেতাম কাঁদতে। চয়নের জন্যে।

—চয়নকে মরতে হ'ল কেন অর্জুন? তুমি কিছু জান?

—সব জানি। চয়নের মৃত্যুর জন্যে দায়ী একমাত্র আমি।

—তুমি তাকে নিজের হাতে খুন করেছ?

—দেবীর সামনে বলি দেয় কসাই, তাই বলে কসাই কী খুনী? না যে তাকে দিয়ে বলি দেওয়াচ্ছে সেই খুনী?

—তুমি কী আমাকে আর একটু কষ্ট করে সব কিছু খুলে বলবে?

খানিকক্ষণ চুপ করে রইল অর্জুন। এক গ্লাস জল খেল। ইতিমধ্যে নার্স এসে তাকে একটা ইনজেকশান দিয়ে গেল। একসময় ধীরে ধীরে সে বলতে শুরু করল।

—জানেন মিস্টার, এ পৃথিবীতে আমাদের আসাটা একেবারেই আন-সার্টেন একটা ঘটনা। মৃত্যু তার চরম পরিণতি। তারপর সব অন্ধকার। যে মরে যায় সে জানতেও পারে না সে মরে গেছে না বেঁচে আছে। মৃত্যু-কালীন সেই যন্ত্রণাটাই তার শেষ অনুভূতি। রিবার্থ বা আত্মায় আমি বিশ্বাস করিনা, তা যদি করতাম তাহলে তার উদ্দেশে আমি বলতাম, তুই যা চেয়েছিলি তাই হবে চয়ন।

—কী চেয়েছিল চয়ন তোমার কাছে?

—আমি যেন আর কোনদিন নেশা না করি। আর আমাকে অধঃপতন থেকে ফিরিয়ে আনার জন্যেই তো তার চলে যাওয়া।

—কী রকম?

—বর্ষাকে আমরা দুজনেই ভালবেসেছিলাম। আমি তাকে পাইনি। সে চয়নকে ভালবাসে। অন্য কেউ হলে আমি প্রতিদ্বন্দ্বী হতাম। কিন্তু চয়নের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে আমি চাইনি। তাই আমি নেশা নিয়ে জীবন কাটিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। অনেকে বলত আমি দুর্বল দেবদাস। না, নেশার মধ্যে বর্ষা আমার চারপাশ ঘিরে থাকতো। হাজার রঙের ফুলঝুরির মধ্যে বর্ষা এসে বসতো আমার পাশে। আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিত। হাসতো, অভিমান করতো। আসলে আমি চেয়েছিলাম বাস্তবটাকে ছাড়িয়ে এক কল্পনার জগতে ভেসে যেতে। নেশাই তো বর্ষাকে আমার কাছে এনে দিত।

—তারপর?

—চয়ন জানতো না। সব শুনে সে বর্ষাকে আমার হাতে তুলে দিতে চেয়েছিল। চয়ন তা করতোই। তাই তো আমি জোর করে ওদের বিয়ে দিয়েছি। সে বলেছিল, আমার কথায় সে বর্ষাকে বিয়ে করবে কিন্তু বদলে

সে চেয়েছিল, নেশামুক্ত সুস্থ অর্জুনকে।

—সেটাই তো তাকে দিতে পারতে।

—সে চেষ্টাই তো করছিলাম। কিন্তু এ বড় সর্বনাশা নেশা। সখ করে ধরা যায় কিন্তু ইচ্ছে করলেই ছাড়া যায় না। আমার নেশা ছাড়াবার জন্যে চয়ন সর্বদাই আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকতো। কিন্তু এ নেশা এমনিই যে সময় মতো খোরাক না পেলে সমস্ত শরীর ছিঁড়ে যন্ত্রণা আর অবসাদ। সে রাতে কোন মতে চয়নকে লুকিয়ে ছুটে গিয়েছিলাম কবরখানার ঠেকে। সবে মাত্র আলি বাখারের হাত থেকে সুগারের প্যাকেটটা নিয়েছি, কোথায় যেন ছিল চয়ন, আসলে সে আমাকে অনুসরণ করেই এসেছিল, এক ঝটকায় আমার হাত থেকে মোড়কটা কেড়ে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আলি বাখারের ওপর। পারবে কেন? ধনী বাপের একমাত্র ছেলে। কোনদিন তো গুণ্ডা বদমায়েসের মুখো-মুখি হয়নি। আমি চয়নকে বাঁচাবার জন্যে আলির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে-ছিলাম। কিন্তু পারলাম না। তার আগেই ঘোর লাগা চোখে দেখলাম চয়নের দেহটা লুটিয়ে পড়ছে মাটিতে। আর আলি ছুটে পালাচ্ছে অন্য দিকে। মাত্র একটা গুলি। চিরদিনের জন্যে ঘুমিয়ে পড়ল চয়ন। সে ঘুম আর কোনদিনই ভাঙ্গবে না।

হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে অর্জুন। সম্ভবত ওকে ঘুমপাড়ানি ইনজেকশান দেওয়া হয়েছিল। ওর চোখ জুড়িয়ে আসছিল। বালিশে মাথা রেখে জড়ানো স্বরে ও বলতে লাগল, অফিসার, চয়নের মৃত্যুর জন্যে আমিই দায়ী, বর্ষার বৈধব্যের জন্যে আমি দায়ী, আমার মায়ের সুখের স্বপ্ন কেড়ে নেওয়ার জন্যেও আমি দায়ী। অমানুষ হিসেবে যা আমি পেতে পারি তার নাম শাস্তি। সেটাই আপনি আমায় দিন। আমার ফাঁসী হোক।

হাতটা তোলার চেষ্টা করেছিল। আচ্ছন্নহাত বিছানাতেই ঢলে পড়ে।

* * *

বাইরে বেরিয়ে আসতে আসতে নীল ভাবছিল, বড় বেশী আবেগপ্রবণ এই ছেলেটির একমাত্র শাস্তি বর্ষার ভাবী সন্তানের পিতৃত্ব গ্রহণ করা। বর্ষা যে কিছুতেই চায়না চয়নের শেষচিহ্ন পৃথিবীর আলো বাতাস থেকে বঞ্চিত হোক।